দাম : সাত টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ৭ মে - ২০১২।।
২৪ বৈশাখ - ১৪১৯

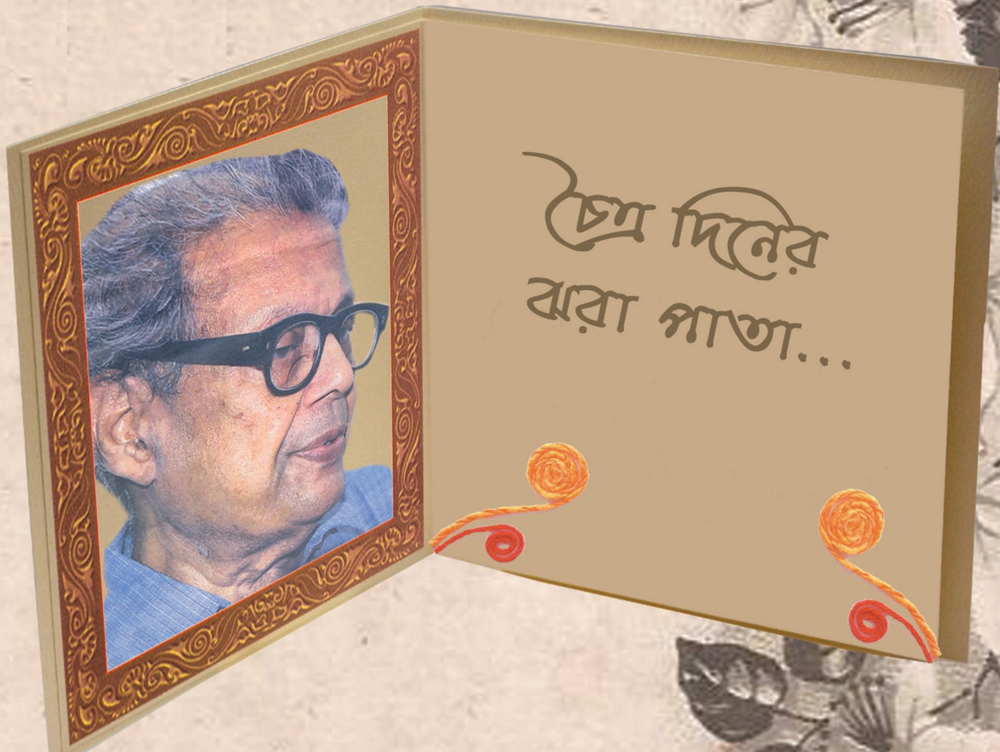

রসসাহিত্যিক হিমানীশ গোস্বামী স্মরণে..

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

হিন্দমোটর নিয়ে তদন্ত হলে সিপিএমের রাঘব-বোয়ালরা ধরা পড়বে □ ৯

এমন নীতিহীন রাষ্ট্রপতির অনুচরেরা দুর্নীতির সর্দার হবে না কেন? □ ১০

তোষণনীতির করালগ্রাসে ভারতবর্ষ □ প্রীতিমাধব রায় □ ১১

জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ □ অমলেশ মিশ্র □ ১২

কৌতুকপ্রিয় হিমানীশ □ চণ্ডী লাহিড়ী □ ১৪

শিবরাম চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে হিমানীশ গোস্বামীর লেখা □ ১৫

পৌরাণিক চরিত্র : আচার্য দ্রোণ □ প্রিয়াংশু বিকাশ ভট্টাচার্য □ ২১

বৈদ্যনাথধাম □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২

শোভাবাজার রাজবাড়ি-ছোট তরফ : কুলদেবতা গোপীনাথ জিউ □ অর্ণব নাগ □ ২৩

যাত্রাশিল্পের প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী কাকলি চৌধুরী □ ইন্দিরা রায় □ ২৬

খোলা চিঠি : তিন মাসে খেউড় রাজনীতির কোর্স চালু করুন □ সুন্দর মৌলিক □ ২৭

মার্কিন সেনা প্রত্যাহার অস্থিরতা সৃষ্টি করবে আফগানিস্তানে □ জি পার্থসারথি □ ২৮

বাংলাদেশে অস্থিরতা : বিপদটা শুধু হাসিনার নয়, ভারতেরও □ সাধন কুমার পাল □ ৩০

গোয়ায় এখন বর্ণময় সুশাসনের আবহাওয়া □ ৩২

গানে কবিতায় স্মৃতিচারণে পূর্ণদাকে স্মরণ □ ৩৭

হিন্দুদের মতো সকলের মঙ্গলকামনা আর কোথাও করা হয়নি : ডঃ কৃষ্ণগোপাল শর্মা □ ৪২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ □ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮ □ □ রঙ্গম : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ২৪ বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৭ মে - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

ফঃ ১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

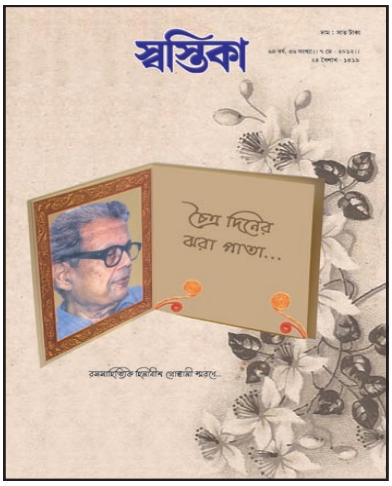

হিমানীশ গোস্বামী স্মরণে
পৃঃ- ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : মাওবাদী মোকাবিলায় সরকার

কখনও ওড়িশা, কখনও ঝাড়খণ্ড, কখনও বা ছত্তিশগড়— মাওবাদী জঙ্গিদের শিকারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। পণবন্দী করে সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে জঙ্গিরা। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রধান বিপদ জেনেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি মাওবাদী জঙ্গি দমনে নিজেদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তেমন সমন্বয় গড়ে তুলতে পারেনি। মাওবাদী দমনে যে দৃঢ়তা ও তৎপরতা দরকার ছিল তা হয়নি। মাওবাদী দমনে সরকারের এই ব্যর্থতার কথাই তুলে ধরেছেন **দীনেশ চন্দ্র বাজপেয়ী** ও **কাঞ্চন গুপ্ত**।

অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ও থাকছে।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

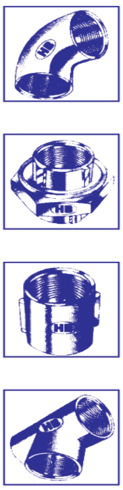

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুর জমি দখল করিয়া আলিগড় ক্যাম্পাস কেন?

মুর্শিদাবাদের আহিরণে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপন করিবার জন্য হিন্দুদের জমি হইতে উৎখাত করিবার চেষ্টা শুরু হইয়াছে। যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একসময়ে দেশবিভাগের চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই একটি ক্যাম্পাস স্থাপন করিবার জন্য পুনরায় সেই একই খেলা শুরু হইয়াছে। ঘটনা হইল ১৯৬৪-৬৫ সালে ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ জমি ক্রয় করিয়াছিল সামান্য দামে। ওই জমির ২৮৮.৩৯ একর জমিও ক্রয় করিয়াছিল ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। সে সময় বলা হইয়াছিল অধিগৃহীত জমির মালিকদের পুনর্বাসন দেওয়া হইবে। অন্যান্যদের পুনর্বাসন দেওয়া হইলেও, উক্ত জমির মালিকদের কোনও পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই। ওই ২৮৮.৩৯ একর জমিতেই রহিয়াছে হিন্দুপ্রধান তিনটি গ্রাম—রসুনপুর, জলাঙ্গীপাড়া ও বাঙ্গাবাড়ি। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল ওই জমি ব্যারেজের কোনও কাজে না লাগায় বাসিন্দাদের পুনর্বাসন মেলেনি। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সেই জমির দখলও লয় নাই। ফলে পুনর্বাসন না মিলিবার কারণ এবং জমি ব্যবহৃত না হওয়ায় তিন গ্রামের ২ হাজার ৪৬৯টি পরিবার ওই জমিতেই বসবাস এবং চাষবাস করিয়া আসিতেছে। ফারাক্কা ব্যারেজের জন্য জমি ব্যবহৃত না হওয়ায় ১৯৮৯ সালের ১৯ জানুয়ারি মহকুমা শাসকের দপ্তরে গ্রামবাসীদের জমি ফেরত দিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। তৎকালীন ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার ইউ এন বালা সেই সময়ের জেলাশাসককে জানাইয়াছিলেন, বাঁধ প্রকল্পের জন্য ওই জমি কোনও কাজে ব্যবহৃত না হইবার কারণে উদ্বৃত্ত জমি সরকারি মূল্যের বিনিময়ে পুনরায় গ্রামবাসীদের ফেরত দিবার ব্যবস্থা করিতে। সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের অধিগৃহীত জমি অব্যবহৃত হইয়া থাকিবার কারণে পুনরায় তাহা ফেরত দিবার দাবি আজকাল অবিরাম করা চলিতেছে। ফারাক্কা কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন গ্রামবাসীদের জমি ফেরত দিবার। ফেরত দিবার জন্য ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সরকারি অর্ডারের কপি বা নকল এখনও রহিয়াছে, তাহা এখনও বাতিল করা হয় নাই। তাই কি করিয়া ওই জমি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধিগৃহীত হইতে পারে?

একবার ভারত-বিভাজন করিয়াও মীরজাফরদের আশা মিটে নাই। ভোটের লোভে মুসলমান তোষণের ফলে মুর্শিদাবাদ আজ হিন্দুশূন্য। আগামীদিনে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ইতিমধ্যে আর পশ্চিমবঙ্গে থাকিবে কিনা সেই প্রশ্ন উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবুও তোষণ বন্ধ হয় নাই। মুর্শিদাবাদ ও মালদার সংখ্যালঘু অঞ্চল লইয়া এই দেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলি বাংলাদেশী মৌলবাদী সংগঠনের সহায়তায় দুই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার লক্ষ্যে গোপনে কাজ করিতেছে—ইহাও ওয়াকিবহাল মহলের অবিদিত নয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়িবার লক্ষ্যে হিন্দুদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার চক্রান্ত সেই প্রচেষ্টার একটি অঙ্গ মাত্র।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

প্রকৃত 'আমিত্ব' সেই পূর্ণব্রহ্ম—মায়া দ্বারাই উহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির আকার ধারণ করিয়াছে। আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতেছে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে উহা সর্বদাই সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এক সত্তাই বিদ্যমান—মায়া দ্বারাই উহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মায়াতেই এইরূপ ভেদবোধ হইয়াছে। কিন্তু এই মায়ার ভিতরেও সর্বদাই সেই একের দিকে ফিরিয়ে যাইবার চেষ্টা রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতির চারিত্রনীতির ভিতর ঐ চেষ্টাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, কারণ ইহা জীবাত্মার প্রকৃতিগত প্রয়োজন। সে ঐরূপ চেষ্টায় ঐ একত্ব লাভ করিতেছে, আর একত্বলাভের এই চেষ্টাকেই আমরা চারিত্রনীতি-নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অতএব আমাদের সর্বদা নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের সম্পত্তির তুঘলকি লুঠতরাজ রুখতে গিয়ে প্রতিহিংসার মুখে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা 'ডিফেন্স ১' নামে চিহ্নিত অতি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি জমি রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের অবসরকালীন আবাস নির্মাণে যথেচ্ছভবে ব্যবহার নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লির ক্ষমতাসীন মহলে সোরগোল পড়েছে। তবে অতি সম্প্রতি এই জমি কাণ্ডে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে, যা প্রায় অন্যায় ভীতি প্রদর্শন, হুমকি ও প্রতিহিংসা চরিতার্থতার মতো নাটকীয় উপাদানে ভরা।

ত্রিপুরার বর্তমান রাজ্যপাল শ্রী ডি. ওয়াই পাটিল যিনি ঘটনাচক্রে মহারাষ্ট্রের একাধিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং সেই সুবাদে মহারাষ্ট্রের বাণিজ্যিক শিক্ষা জগতের একজন বড় মনবসদার বলেই খ্যাত। পদ্মশ্রী ডঃ ডি. ওয়াই পাতিল এডুকেশন সোসাইটির তিনি আবার সভাপতিও বটে। তাঁরই নামাঙ্কিত শিক্ষণ সংস্থার এক কর্তার মাধ্যমে তিনি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সুরেশ পাতিলের সঙ্গে পুণেতে অত্যন্ত সঙ্গোপনে যোগাযোগ করেন। বলে রাখা দরকার, এই কর্ণেল পাতিলই রাষ্ট্রপতির অবসরকালীন বাসভবন নির্মাণে সেনাবাহিনীর বিপুল জমির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন — whistle blower-এর কাজ করেছেন। কর্নেল পাতিল ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্টের নামে চিহ্নিত অতিরিক্ত 'এ ওয়ান জমি' অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ফেরত দেওয়ার দাবীতে বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত করেছেন। পুণেস্থিত বিভিন্ন প্রমোটার সংস্থার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আধিকারিক রবীন্দ্র পাঠক, অনুপ অবস্তী প্রমুখ সরকারি জমির এই অন্যায় ও অসংগতিপূর্ণ বন্টনের তীব্র বিরোধিতার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। খবরে প্রকাশ এমন একটি ন্যায়সঙ্গত দাবীর সমর্থনে পুণের নাগরিকবৃন্দও এই আন্দোলন ও বিক্ষোভ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছেন।

সুরেশ পাতিল

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ত্রিপুরার রাজ্যপাল ডি. ওয়াই পাটিল তড়িঘড়ি বি ডি কোতকার নামে তাঁরই এক অনুগৃহীতকে পুণের 'খাডকী ক্যান্টনমেন্টের' অভিজাত এলাকায় ৩৮ ও ২৬-এ নং এর দু'দুটি বাংলো ও জমি রাষ্ট্রপতির জন্য বরাদ্দকরণকে চ্যালেঞ্জ জানানো ওই কর্নেল পাতিলের কাছে পাঠান। সংবাদসূত্র অনুযায়ী শ্রী কোতকার কর্ণেল পাতিলকে ব্যাপারটা চেপে যেতে বলেন। তবে তাঁকে হতাশ করে কর্ণেল পাতিল পত্রপাঠ জানিয়ে দেন বাড়তি জমিতে পুণে জেলার ১০২ জন যুদ্ধ-বিধবা ও তিনশোর অধিক যুদ্ধাহত সৈনিকদের বাসস্থান নির্মাণের সিদ্ধান্ত সরকার না নেওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন আরও তীব্র করে তুলবেন।

সংবাদসূত্র অনুযায়ী কর্ণেল পাতিল ও তাঁর অনুগামীদের এই অনমনীয় মনোভাবেই কায়েমী স্বার্থন্বেষীরা মরিয়া হয়ে ওঠে। সাদার্ন কম্যান্ড ডিফেন্স অফিস (DEO)-এর তরফ থেকে শুরু হয় পাল্টা হামলা। পুণের ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলের 'ওনোওরী' থানায় কর্নেল পাতিলের নামে অধিকার বহির্ভূত বেআইনী কাজকর্ম করার অভিযোগ দাখিল করা হয়। কর্নেলের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি মুম্বাই থাকাকালীন গত ১৭ এপ্রিল সেনাবাহিনীর লোকজন তাঁর পুণের বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তাঁর বাড়ি, কার্যালয় ইত্যাদির জরিপ করার পর তারা কর্ণেলের বিরুদ্ধে নানান অবৈধ নির্মাণের অজুহাত খাড়া করেছে। এই মর্মে তারা পুণে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কাছে কর্নেল পাতিলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ারও আর্জি জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ণেল পাতিলের নিজস্ব কোনও বাড়ি নেই। তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে অবসর নেওয়ার পর থেকে তিনি ভূতপূর্ব মেজর ডি. ভি পানসের মালিকানাধীন ওই বাংলোটির একটি পরিত্যক্ত ভগ্নাদশাপ্রাপ্ত ১৬৯৪ স্কোয়ার ফুট অংশে বসবাস করছেন। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার আগে পর্যন্ত পুণে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড তাঁর বাসস্থান সম্বন্ধে কখনও কোনও খোঁজখবর নেয়নি। কর্ণেল পাতিল জানিয়েছেন যে ১৯৭১-এর যুদ্ধে তিনি ৬ জন সহকর্মী অফিসার, ৬৭ জন সহযোদ্ধাকে মরতে দেখেছেন। তাঁদের বাসস্থান সবার আগে নিশ্চিত না করা পর্যন্ত এই সংগ্রাম তিনি চালিয়ে যাবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই জমি ও বাঙলো আত্মসাৎ কাণ্ডে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী— উত্তর মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও অঞ্চলের এক ছাপোষা বস্ত্র ব্যবসায়ী ও অবসর সময়ের সমাজ সেবক সৈয়দ আফিস আলী নামের এক যুবক ঘটনা পরম্পরার নিকৃষ্টতায় ব্যথিত হয়ে তাঁর পারিবারিক সম্পত্তি থেকে ৪.৫ একর জমি বিনামূল্যে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি প্রতিভা পাতিলকে তাঁর অবসরকালীন গৃহনির্মাণের জন্য উপহার দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শর্ত একটিই—ভারতীয় সেনাবাহিনীর জমিটি রাষ্ট্রপতিকে সেনাবাহিনীকেই ফিরিয়ে দিতে হবে যেখানে নির্মিত হবে যুদ্ধ-শহীদ পরিবারের আবাসস্থল। সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী ফাঁদে পড়া রাষ্ট্রপতি লোভ সংবরণ করে সেনাবাহিনীর সম্পত্তি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

নতুন শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন : আবার কি ভিটেবাড়ি হারাবেন হিন্দুরা ?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। সংশোধিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী সরকার ইজারা দেওয়া এক লাখ ৮৯ হাজার ৬৬৩ একর অর্পিত সম্পত্তির (শত্রু সম্পত্তি) তালিকা চূড়ান্ত করেছে। এই তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশের জন্যে সরকারি ছাপাখানায় পাঠানো হয়েছে। জানা গেল, ছাপার কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। গোল বেধেছে ইজারা না দেওয়া প্রায় পৌনে পাঁচ লাখ একর অর্পিত সম্পত্তির (শত্রু সম্পত্তি) তালিকা নিয়ে। হিন্দুরা আশঙ্কা করছেন, এই তালিকা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়ায় বহু নতুন সম্পত্তি যুক্ত হয়ে যেতে পারে কিংবা যুক্ত করার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের পথ তৈরি হতে পারে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের কয়েকজন নেতা বলেছেন, ইতিমধ্যে তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এ ধরনের পাঁয়তারা চলছে বলে অভিযোগ পেয়েছেন। পরিষদের নেতারা আরও উদ্বিগ্ন, অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি সমস্যার 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নামে' বিক্রির প্রশ্ন উঠলে আরও বিপদে পড়বেন ওই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বা সহ-অংশীদারগণ।

ইজারা দেওয়া প্রথম তালিকার সম্পত্তির দলিল সহ তথ্যাদির প্রমাণ আছে, সরকারিভাবেই তা ইজারা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এসব সম্পত্তি সরকারের হাতে আছে। কিন্তু দ্বিতীয় যে তালিকা তৈরি হচ্ছে সেসব সম্পত্তি সরকারের হাতে নেই। এই তালিকা নিয়ে লুকোচুরি আছে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় জারি করা জরুরি অবস্থার অংশ হিসেবে শত্রু সম্পত্তি আইন বলবৎ হয়। তখন থেকে আমলা, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদরা হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দেখিয়ে তাদের সম্পত্তি গোগ্রাসে গিলেছেন, দেশছাড়া করেছেন লাখ লাখ পরিবারকে। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হলেও শত্রু সম্পত্তি আইনটি অব্যাহত রাখা হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে (যে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, কয়েক লাখ মা-বোন নির্যাতিত হয়েছেন, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় দেশ এবং এক কোটির মতো মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়) প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশেও এই আইন নাম পাল্টে বহাল রাখা হয়। মুক্তিযুদ্ধে ভারত প্রধান মিত্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রাণে দাঁড়ালেও এই আইন বহাল থাকায় ভারত শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের শপথ গ্রহণের পর বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সকল পাকিস্তানি আইন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ আদালতেও এই আইন মৃত বলে রায় দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও এই আইন রয়েছে, দিনে দিনে কঠোর হয়েছে, হিন্দু সম্পত্তি গ্রাসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ২০০১ সালে শেখ হাসিনার প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ পর্যায়ে অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়ন করা হয়। উত্তরাধিকার প্রশ্নে জটিলতা থাকায় হিন্দুরা আপত্তি জানালেও তখন গ্রাহ্য করা হয়নি। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষ করার আগেই অবশ্য নির্বাচনে আওয়ামি লিগ হেরে যায়। বি এন পি-জামায়াতে ইসলামি জোট ক্ষমতায় এসে এই আইনটি নিয়ে আর এগোয়নি, বরং নতুনভাবে অর্পিত সম্পত্তি তালিকা সম্প্রসারণ করার পদক্ষেপ নেয়। তবে তীব্র আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক ভাবে চাপের মুখে পিছু হটে আসে। তদারকি সরকারের সময়ও একবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তীব্র প্রতিবাদে তারাও পিছু হটে। এবার আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার উত্তরাধিকার ও সহ-অংশীদারের সংজ্ঞা বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের দাবি অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্ধারণ করে ২০০১ সালের আইন সংশোধন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বিপত্তি দ্বিতীয় তালিকা নিয়ে।

এছাড়া নতুন আইন অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে নিষ্পত্তি কমিটি হয়েছে। জেলা কমিটিতে একজন সাংসদ উপদেষ্টা থাকবেন, প্রাধান্য থাকবে সরকারি আমলাদের। কেন্দ্রেও দাপট থাকবে আমলাদের। অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করে হিন্দুদের ভিটেবাড়ি ছাড়া করতে যে আমলারা রাজনীতিকদের পাশে বসে ছড়ি ঘোরাবেন— এটাই উদ্বেগের কারণ হিন্দুদের। ঐক্য পরিষদের অনেকেই আরও প্রশ্ন তুলছেন, কোনও যৌথ পরিবারের কেউ কিংবা কোনও শরিক ভারতে চলে গেলে সেই সম্পত্তি পুরোটাই শত্রু (অর্পিত) ঘোষণা করা হয়। অথচ আইন অনুযায়ী যিনি গেছেন শুধু তার সম্পত্তিটুকুই শত্রু সম্পত্তি হওয়ার কথা। কিন্তু ভোগান্তি গোটা পরিবারের। এখন নতুন আইন অনুযায়ী ওই পরিবারের বাংলাদেশে বসবাসরত সদস্যরা যদি কোনও কারণে তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি আইনের আওতাবহির্ভূত প্রমাণে ব্যর্থ হন তাহলে ওই সম্পত্তি নিলামে উঠবে।

অথবা যে সম্পত্তি অন্য শরিক বা পরিবারের সদস্য ফেলে গেছেন শুধু সে সম্পত্তিও যদি নীলামে ওঠে এবং বর্তমান প্রচলিত দরে কিনে নিতে হয় তাহলে তাদের কারও পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। কারণ সে আর্থিক সামর্থ্য তাদের কারো নেই। স্বাভাবিকভাবে কোনও মুসলমান সেই সম্পত্তি পুরো অথবা আংশিক কিনে নেবেন। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশে এভাবেই আইনি প্রক্রিয়ায় বাড়িভিটে হারাবেন হিন্দুরা। অথবা পৈতৃক বাড়িতে বাস করতে হবে মুসলমান পরিবারের সঙ্গে। সে জন্যেই কী নতুন আইনে মূল্যটা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি?

সুদ মকুবে রাজ্যের আর্থিক হাল ফিরবে না
সংকট আরও তীব্র হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্ল্যাকমেল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো কিছু অনায্য দাবি আদায় করে আনতে চলেছেন। হয়তো বা তিন বছরের জন্য সুদ মকুবের ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু রাজ্যের ভেঙে পড়া আর্থিক কাঠামো তিন বছরের সুদ মকুবের জেরে শুধরে যাবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। অন্তত রাজ্যের অর্থ দপ্তরের কর্তাদের এমনটাই অভিমত। তাঁরা দাবি করেছেন, রাজ্যের ঘাড়ে গত তিন দশক ধরে ২ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকার যে ঋণের বোঝা চেপেছে তা তিন বছরের সুদ মকুবের ফলে উধাও হয়ে যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোনও একটি রাজ্যের জন্য ঋণ বা সুদ মকুব করা এত সহজ কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গকে কিছু বাড়তি সাহায্য দিলে তামিলনাড়ু এবং কেরলের মতো রাজ্যও চিৎকার করবে। পাঞ্জাব প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্য। সেই পাঞ্জাবেও বিশেষ কোনও সুবিধা দিতে পারেননি মনমোহন সিং সরকার। সেক্ষেত্রে জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতার জেরে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গকে সুদ বা ঋণের আসল শোধের ব্যাপারে রেহাই দেওয়া যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের দাবি, তিন বছরের সুদে রেহাই মিললে রাজ্যের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টে ৮৮ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত জোগান হবে। যা দিয়ে উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দেওয়া যাবে। যদিও অর্থ দপ্তরের অফিসারদের যুক্তি, সুদ রেহাই পেলে হয়তো কিছু টাকা বাড়তি সংস্থান হবে। কিন্তু তা দিয়ে রাজ্যকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যাবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। কারণ, রাজ্যের ভাঁড়ার এখন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রেখে চলছে। বিভিন্ন প্রকল্পে ম্যাচিং গ্রান্টও দিতে পারা যাচ্ছে না। ফলে উন্নয়ন কাজ সময়মতো শেষ হওয়া মুশকিল। সুদ শোধ করতে না হলে হয়তো সময়মতো কেন্দ্রীয় সাহায্যের টাকা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু তিন বছর পর আবার 'পুনর্মূষিকো ভব' দশা হবে। বছরে এখন ঋণ আর সুদ শোধ করতে ২২ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। সেই টাকা তখন এক বছরে তুলতে কালঘাম ছুটে যাবে।

তাহলে কীভাবে সমস্যা মিটবে? অর্থ দপ্তরের অফিসারদের যুক্তি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার জন্য রাজ্যের নিজস্ব খরচ কমাতে হবে। অন্যদিকে আয় বাড়াতে হবে। আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে একদিকে যেমন কর কাঠামোর সংশোধন জরুরি। কিছু ক্ষেত্রে কর বাড়িয়ে কিছু ক্ষেত্রে কর কমিয়ে আয় বাড়ানোর পথে হাঁটা যেতে পারত। কিন্তু সেসব হয়নি। অন্যদিকে কর আদায়ে চুরি-দুর্নীতি বড় অন্তরায়। অন্তত ৫০ শতাংশ ব্যবসায়ী, ডিলারদের কাছ থেকে কর আদায়ই হয় না। সেই চুরি বন্ধ করতে হবে। কিন্তু নতুন অর্থমন্ত্রী যে যে পদক্ষেপ করছেন তাতে কর আদায় মোটেই বাড়বে না। এরমধ্যে আবার পণ্য প্রবেশকর বসানো হয়েছে। সেই কর আদায় নিয়ে চুরির নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

আর একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হলো, রাজ্যের নিজস্ব খরচ কমানো। কিন্তু পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে কোটি কোটি টাকার অপব্যয় হচ্ছে। সেই টাকা সাশ্রয় করতে পারলেও লাভ ছিল। দুটি দিকেই ব্যর্থ হওয়ায় আগামী দিনে রাজ্যের আর্থিক সংকট কেটে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখছেন না অর্থ দপ্তরের অফিসাররা। তাহলে উপায়, তাঁরা বলেছেন, কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া উপায় নেই। যতদিন ইউ পি এ সরকার আছে ততদিন হুমকি দিয়ে কিছু টাকা আদায় করে আনা যেতে পারে।

ইউ পি এ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিদেশযাত্রায় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারীতে নাজেহাল ইউপিএ-২ সরকারের মন্ত্রীদের বিদেশ-যাত্রায় আর্থিক অনিয়ম এবার প্রকাশ্যে চলে এল। গত ২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে মন্ত্রীদের বিদেশযাত্রার জন্য বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪৬.৯৫ কোটি টাকা। কিন্তু এই খরচের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৯৯.৮৯ কোটি টাকা। তাও ২০০৯-এর জুন থেকে এ পর্যন্ত ২৫ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর (এঁদের মধ্যে চারজন বর্তমানে আর মন্ত্রী নেই) ৩৯ বার সরকারি খরচে বিদেশ-যাত্রার অনুমোদন দেয়নি কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন কে ডি থমাস, শ্রীপ্রকাশ জয়সোয়াল, এম বীরাপ্পা মইলি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, সুশীল কুমার সিন্ধে, সৌগত রায়, শচীন পাইলট, ফারুখ আবদুল্লা, শরদ পাওয়ার, আনন্দ শর্মা, প্রফুল্ল প্যাটেল, সুবোধকান্ত সহায়, সি পি যোশী, ভিনসেন্ট এইচ পালা, হরিশ রাওয়াত, মহাদেব এস খাড্ডেলওয়াল, কৃষ্ণ তিরথ, আর পি এন সিং, অজয় মাকেন, মুকুল ওয়াসনিক ও পানাবাকা লক্ষ্মী। এঁদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক কে ডি থমাসের চারবার সরকারি খরচে বিদেশ যাত্রার আবেদন বাতিল করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক। এছাড়াও বর্তমানে মন্ত্রিত্ব নেই এমন চার ব্যক্তি— গুরুদাস কামাত, এ. রাজা, এম এস গিল, দয়ানিধি মারানেরও ছ'বার বিদেশযাত্রার আবেদন বাতিল হয়েছে। ইংরেজি দৈনিক দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের জনস্বার্থে করা তথ্য জানার অধিকার আইনে এই তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

এহেন তথ্যে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে ঝড় উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিদেশ যাত্রায় গত আর্থিক বর্ষে বাজেট বরাদ্দের প্রায় সাড়ে ছ'গুণ বেশি খরচ হলো কার নির্দেশে? সরকারের তরফে এর সদুত্তর অবশ্য মেলেনি। কংগ্রেসী মহল থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিদেশ যাত্রার অনুমোদন না দেওয়াকেই প্রকাশ্যে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গেও প্রশ্ন উঠছে। বিভিন্ন কারণে ওই মন্ত্রীদের সরকারি খরচে বিদেশ-যাত্রার অনুমোদন বাতিল হলেও, তার মধ্যে 'রাজনৈতিক ছাড়পত্রে'র ব্যাপারটাই প্রাধান্য পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে সরকারি বিদেশনীতিই এখন প্রশ্নের সম্মুখীন।

হিন্দমোটর নিয়ে তদন্ত হলে সিপিএমের রাঘব বোয়ালরা ধরা পড়বে

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

পরাজিত বামফ্রন্ট তথা সিপিএম সরকারের একের পর এক কেলেঙ্কারি ফাঁস হচ্ছে। এর একটি হলো হিন্দমোটর জমি কেলেঙ্কারি। এখনকার অডিট-এ বলা হয়েছে— ২০০৬-এর ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালের ভূমি সংস্কার আইনের ১৪ জেড ধারা বলে ভূমিদপ্তর হিন্দমোটরকে ৩১৪ একর জমির মালিকানা দেয়। এই আদেশনামা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যে, এই জমি ভূমিদপ্তর দিতে পারে কি না? অডিট-এ দেখা গিয়েছে হিন্দমোটর জমিটি বিক্রি করে ৮৫ কোটি টাকা পাবে বলে সরকারকে জানিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো, কিসের ভিত্তিতে ৩১৪ একর জমির দাম ৮৫ কোটি টাকা বলে ভূমিদপ্তর মেনে নিয়েছিল? বাস্তবে ওই জমি ২৮৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১৬.৭৪ কোটি টাকা কারখানার পুনরুজ্জীবনে, ৩৮.৬৬ কোটি টাকা জমি সংক্রান্ত বিষয়ে খরচ হয়েছিল। বাকি ২২৯ কোটি টাকা সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এই বিষয়ে তদন্তের কথায় রেজ্জাক-এর মন্তব্য— ''বোল শোল এবং রাঘব বোয়ালরা ধরা পড়বে।'' শুধু হিন্দমোটরই নয়, লোহাচুর কেলেঙ্কারি, খাদ্য দপ্তরের কেলেঙ্কারি এমনকী পূর্ত দফতরেও তদন্ত করলে বহু তথ্য জানা যাবে।

হিডকো-তে পি আর ও হিসাবে অঞ্জন ভট্টাচার্য-কে চাকরি দিয়েছিলেন গৌতম দেব। তিনি তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। আবার এই ব্যক্তি কীভাবে পি আর ও থেকে স্পেশাল অফিসার অন-ডিউটি-তে পদোন্নতি পেলেন? এসবই তদন্ত হওয়ার দরকার। সিবিআই-এর হাতে তদন্তের ভার দেওয়া উচিত হবে।

রাজ্যের সিপিএম-নেতৃত্বের কেলেঙ্কারি চেপে রাখা যাবে না। রেজ্জাকের কথায়— 'পোড়া ঘা ফুটে উঠবে।' বুদ্ধ-নিরুপম-বিমানদের কেচ্ছা যাতে পার্টিকংগ্রেসে ফাঁস না হয় তার জন্যই রেজ্জাককে বলতে দেওয়া হলো না। এ ব্যাপারে রবীন দেবও দায়ী। তবে নেতাদের কথা শুনলেও রবীন দেবের আর পদোন্নতি হবে না।

বিমানবাবু তাঁর গোষ্ঠীর দীপক দাশগুপ্ত ও নৃপেন চৌধুরীকে এক ধাপে উঁচুতে তুলে দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান করে দিলেন। একটা কথা পাঠকদের জানাই, প্রকাশ কারাত ইয়েচুরি কোম্পানির সঙ্গে থেকেই বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, জ্যোতি বসুকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করার জন্য কারাত-ইয়েচুরি-বুদ্ধ একমত ছিলেন। কারাত-এর সমালোচনা বুদ্ধবাবু করবেন না— কারাত-ইয়েচুরিও বুদ্ধবাবুকে কোনওভাবে সরাবেন না। এতো পরস্পর পিঠচুলকানি সমিতি! সিপিএম-নেতৃত্বের ধসারোগ ধরেছে। তাই ধসে যাচ্ছে। এই নেতৃত্ব পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে না।

প্রকাশ কারাত ইয়েচুরি কোম্পানির সঙ্গে থেকেই বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, জ্যোতি বসুকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করার জন্য কারাত-ইয়েচুরি-বুদ্ধ একমত ছিলেন। কারাত-এর সমালোচনা বুদ্ধবাবু করবেন না— কারাত-ইয়েচুরিও বুদ্ধবাবুকে কোনওভাবে সরাবেন না। এতো পরস্পর পিঠচুলকানি সমিতি!

সিপিএমের সরকারি কর্মীদের সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটি কাগুজে বাঘ। যতই গর্জন করুক, বর্ষণ করতে পারল না। মাথা হেঁট করে থাকতে হলো। এই অবস্থা প্রতি স্কুল, কলেজ, সরকারি সংস্থা, পরিবহণ সংস্থায় সৃষ্টি হবেই। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। বুথে বুথে কর্মী দিতেও পারবে না।

সিপিএম আমলে যেভাবে ভোটদান হয়েছিল সেটারই পুনরাবৃত্তি হবে। পুলিশ-প্রশাসন সব সময়ে সরকারি দলের দিকেই থাকবে। রাজ্যের বর্তমান শাসকদল কোনও বিরোধিতা মানবে না— এটা সাফ কথা। সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, কর্মস্থলে কোনও রাজনীতি (তৃণমূল বাদে) করা চলবে না। তৃণমূলের ছাত্র-নেতা শঙ্কু পণ্ডা বলেছেন, 'কলেজে পড়াতে গেলে সিপিএম করা চলবে না।' অর্থাৎ সিপিএম সমর্থক কর্মীদের সন্তান উচ্চশিক্ষা পাবে না।

এর আগেই খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেছেন, 'সিপিএমকে সামাজিক স্তরে বয়কট করতে হবে। কোনও বৈবাহিক সম্পর্ক সিপিএমের সঙ্গে করা যাবে না।' মুকুল রায় বলেছেন, সিপিএমের বিরুদ্ধে 'ঘৃণা ছড়াতে হবে' অর্থাৎ হেট ক্যাম্পেন। সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'সিপিএমকে নিষিদ্ধ করা হোক।'

নদীয়ার কালীগঞ্জে একটি মাদ্রাসা দখল করা নিয়ে সিদ্দিকুল্লা বলেছেন, 'তৃণমূল বিপজ্জনক খেলা খেলছে।' আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘেরাও আন্দোলন হলো। শিক্ষক-ছাত্র-অধ্যাপকরা রাজনীতি করতে পারবেন না। অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরাই স্কুলে-কলেজে-মাদ্রাসাতে প্রধানকর্তা হবেন। কারণ একটাই— তাকে তৃণমূলের কর্মী হতে হবে। তৃণমূলের প্রবীণদের সরিয়ে নবীনদের আনার কারণ হলো আনুগত্য এবং নেত্রীর বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন তুলবে না।

এমন নীতিহীন রাষ্ট্রপতির অনুচরেরা দুর্নীতির সর্দার হবে না কেন ?

ভারতে ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের আর খুব দেরি নেই। বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল দিল্লীর ঐতিহাসিক রাষ্ট্রপতি ভবনে সপরিবারে জাঁকিয়ে বসেন ২০০৭ সালের ২৫ জুলাই। তার আগে ১৯ জুলাই তিনি রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ কোনও একদিন রাষ্ট্রপতিপদের প্রার্থীদের নির্বাচন করবেন দেশজুড়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। এখানেই সমস্যা রয়েছে। সারা দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যার বিচারে কোনও একটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হতে পারা কঠিন। একমাত্র জোট প্রার্থীদেরই জয়ের সম্ভাবনা আছে। যাইহোক, সেসব পরের কথা। এই অবসরে শ্রীমতী পাতিলের রাষ্ট্রপতিপদে থাকার সুবাদে তাঁর পাঁচ বছরের কর্ম কৃতিত্বের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

প্রতিভা পাতিলকে খুঁজে বের করে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া। শ্রীমতী পাতিলের রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু হয় মহারাষ্ট্রে। মহিলারা তখন বিপুল সংখ্যায় রাজনীতিতে দ্রুত যোগ দিতেন না। তাই মহিলা রাজনীতিক হিসাবে তিনি মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে উপরে উঠে আসেন। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী হন। এরপরেই শুরু হয় আর্থিক দুর্নীতির খেলা। মন্ত্রী প্রতিভা পাতিলকে সামনে রেখে তাঁর স্বামী, পুত্র, আত্মীয়রা প্রতারণার ব্যবসা শুরু করে দেয়। মহারাষ্ট্রে দরিদ্র চাষীদের নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার নাম করে স্বামী, পুত্র, পরিজনরা সমবায় ব্যাঙ্ক খুলে বিশাল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়। ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। আমানতকারীরা পথে বসে। ক্ষমতায় থাকার সুবাদে দুর্নীতিপরায়ণ কংগ্রেস দল ব্যাঙ্ক জালিয়াতির তদন্ত ধামাচাপা দেয়। বিপদে পড়েন মহারাষ্ট্রের রাজ্য কংগ্রেস নেতারা। প্রতিভাকে মন্ত্রী রাখা মানে তাঁর স্বামী, পুত্রদের সরকারি অর্থ লুঠ করার সুযোগ করে দেওয়া। বাধ্য হয়ে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড প্রতিভা পাতিলকে রাজ্যপাল করে মহারাষ্ট্রের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। যে সব রাজ্যে তিনি রাজ্যপাল হয়েছেন সেখানে তাঁর স্বামী দেবী সিং মহাশয়ের কীর্তিকলাপ আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে।

গত ২০০৭ সালে প্রতিভা পাতিল রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হয়েই জানিয়ে দেন যে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর পরিবারের (পড়ুন বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি) সকল সদস্য আগামী পাঁচ বছর বাস করবেন। এমনকী গ্রামতুতো আত্মীয়রাও যতদিন খুশি রাষ্ট্রপতিভবনে বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসাবে বাস করবেন। এই বিশাল পরিবারের খানাপিনা, বিনোদনের সব খরচই রাষ্ট্রপতির তহবিল থেকে যাবে। মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রপতি ভারতের সাংবিধানিক প্রধান। তাঁর জীবনযাত্রার জন্য সরকারি খরচে রাশ টানা যায়

না। প্রতিভা পাতিল সেই সুযোগটাই নিয়ে ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর ভাগ্যে একবারই রাষ্ট্রপতি হওয়ার সুযোগ মিলেছে। দ্বিতীয়বার এমন সুযোগ আসবে না। তাই রাষ্ট্রপতিপদে থাকাকালে তিনি ১২ বার বিদেশ সফরে গিয়ে ২২টি দেশ ঘুরেছেন। এর জন্য ভারত সরকারের খরচ হয়েছে ২০৫ কোটি টাকা। আজ পর্যন্ত ভারতের দ্বিতীয় কোনও রাষ্ট্রপতি বিদেশে বেড়াতে গিয়ে এমন বিপুল অর্থ ব্যয় করেননি। এর একটা বড় কারণ, রাষ্ট্রপতির বিদেশ সফরে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও যোগ দিয়েছে। সরকারি খরচে রাজকীয় বিদেশ ভ্রমণের এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? দেশের রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর পরিবার যদি এমন নীতিহীন হন তবে কংগ্রেসের চুনোপুঁটি নেতারা দুর্নীতির সর্দার হবে না কেন? ভুললে চলবে না যে প্রতিভা পাতিলকে সোনিয়া গান্ধী যখন রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করেন তখন প্রতিভা এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক প্রতারণার ফৌজদারি মামলা চলছে। সাম্প্রতিককালে তাঁর পুত্র বিপুল পরিমাণ কালোটাকা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে। রাষ্ট্রপতি তাঁর পদের প্রভাব খাটিয়ে মামলাটি ধামাচাপা দেন। এর পরেই তিনি বুঝে যান যে কংগ্রেস নেত্রী তাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতিপদে প্রার্থী করবেন না। তাই রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বিদায় নেওয়ার আগে তাঁর অবসরকালীন বাসভবনের ব্যবস্থা পাকা করে নিতে

গূঢ়পুরুষের

কলম

চেয়েছিলেন সংগোপনে। পুণায় প্রতিরক্ষা দফতরের নিয়ন্ত্রণে থাকা ২ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গফুট জমি হাতিয়েও নিয়েছিলেন। গোল বাঁধালো ওই জমিতে বাড়ি বানাতে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে ৮৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে চিঠি দিতে। রাষ্ট্রপতিদের অবসরের পর সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারই দিল্লীতে তাঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। তবে কেউ যদি দিল্লীতে না থেকে তাঁর দেশের বাড়িতে অথবা অন্য পছন্দমতো এলাকায় নিজের বাড়ি বানিয়ে থাকতে চান সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এককালীন সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়। শ্রীমতী পাতিল ৮৫ লক্ষ টাকা চেয়ে বসায় বিপদে পড়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। খবরটি সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে যায়। দেশজুড়ে তুমুল সমালোচনার ঝড়ে মাথা হেঁট করে পুণার জমি সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন প্রতিভা। তাঁর ৮৫ লক্ষ টাকার দাবিও কেন্দ্রীয় সরকার খারিজ করে দেয়। সংবাদমাধ্যমের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা যায় যে ভারতের রাষ্ট্রপতিপদে সবচেয়ে নিকৃষ্ট রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল। মনে রাখবেন, প্রতিভা পাতিলকে রাষ্ট্রপতি করার পিছনে নীতিশুদ্ধ বামেদের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

তবে রাষ্ট্রপতি পদে বসে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রথম নজির রেখে ছিলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি একবার দক্ষিণ ভারত সফরকালে একজন সুন্দরী যুবতী নার্সকে তাঁর সফরসঙ্গিনী করে নিয়ে যান। সেই নার্সের নার্সিংয়ে মোহিত হয়ে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহিলাকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি পাইয়ে দেন। আমাদের দেশের মাত্র দুইজন রাষ্ট্রপতি যাবতীয় বিতর্কের উর্ধ্বে নিজেদের রেখে ছিলেন। একজন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং দ্বিতীয়জন, এ পি জে আব্দুল কালাম। কিন্তু দেশে ক্ষমতাসীন ইউপিএ জোটের প্রধান শরিক কংগ্রেস দলের প্রথম পছন্দ নীলম সঞ্জীব রেড্ডি, জ্ঞানী জৈল সিং, প্রতিভা পাতিলের মতো নৈতিক মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিদের।

তোষণনীতির করালগ্রাসে ভারতবর্ষ

প্রীতিমাধব রায়

জার্মান দার্শনিক উইল হেলথ্ ফ্রিডরিখ্ হেগেল বলেছেন, ইতিহাস থেকে আমরা এইটাই শিখি যে, 'ইতিহাস থেকে আমরা কিছুই শিখি না।'

ভারতের সাম্প্রতিককালের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো এই যে, সাম্প্রদায়িক তোষণনীতি সাম্প্রদায়িকতা অবলুপ্ত করে না, বরং তাকে বৃদ্ধি করে। সাম্প্রতিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তার চেয়ে তীব্র দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও সুচিন্তাশীল নেতা ভারতে আরও জন্মে থাকতে পারেন, কিন্তু সর্বভারতীয় আন্দোলন ডাকার ক্ষমতা কেবল তাঁরই ছিল। সেইসব আন্দোলন যে সর্বক্ষেত্রে সফল হয়েছিল এমন নয়, কিন্তু সারা দেশকে ডাক দিতে তিনিই পেরেছেন। তবুও একথা সত্য যে, দেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে তাঁর যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, দেশকে বিভাজিত করার পিছনেও তাঁর কোনও কোনও ভ্রান্তি ছিল। এই ভ্রান্তি আরম্ভ খিলাফৎ আন্দোলন থেকে। দেশের নেতা হতে হলে কেবল সেই সব কর্মপন্থাই গ্রহণ করতে হবে যা কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে আলাদা ভাবে দেখবে না, সমস্ত দেশবাসীকে সমানভাবে দেখবে।

শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের জনক-রূপে বৃত হওয়ার পর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে কিছু নেই, বাংলাদেশের নাগরিক হলো বাংলাদেশী, এখানে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বলে কিছু নেই, এখানে সকলের সমান অধিকার। বাংলাদেশ সেই সমদর্শনের নীতি সত্যই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতেই পারে, কিন্তু মুজিবর সাহেবের উক্তিটিতে অসাম্প্রদায়িকতার মূলসূত্রটি আছে। অসাম্প্রদায়িকতা বলতে বোঝাবে সম্প্রদায় মাত্রেই উল্লেখ না করা। অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক ভারত বলতে বোঝাবে, যেখানে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও সম্প্রদায় কোনও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবে না, বা কোনও সম্প্রদায়কে হীন চোখে দেখা হবে না।

অনেক মুসলমান প্রধান দেশে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়, দেশের শাসনব্যবস্থাতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা স্পষ্টভাবেই বলা হয়, ইসলাম বা পয়গম্বরের নামে কোনওরকম কটূক্তি বা অসম্মান প্রদর্শন করলে তাঁর শাস্তি হলো মৃত্যু, কিন্তু অন্য ধর্মের অপমান করতে এই ধরনের কোনও শাস্তির বিধান নেই। অনেক ইসলামী দেশে অমুসলমানদের নিজ নিজ ধর্মপালনেও অনেক বাধা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার এক সময়ে অশ্বেতাঙ্গদের অধিকার খণ্ডিত করার জন্য বিশ্ববাসী সেই দেশের শাসনব্যবস্থাকে একঘরে করেছিল। ওই নীতি অনুযায়ী ওইসব দেশের নাগরিকদের পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশেই সীমাবদ্ধ অধিকারে রাখা উচিত, কিন্তু কোনও দেশই তা করে না।

স্বাধীনতার আগে ও পরে চিরকালই কংগ্রেস মুসলমান তোষণ করে এসেছে। সংবিধানকে তুচ্ছ করে শিক্ষা, চাকরী ও অন্য অনেক ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ করে এসেছে, তার ফল সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি। যার ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক অংশের ক্ষতি হয়েছে। শাহবানু মামলার পর মুসলমান তোষণের জন্য কেবল

সোজা-সাপ্টা

ইমাম-ভাতা

ভোটের লোভে রাজীব গান্ধীর সরকার যে ব্যবস্থা করেন, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়। সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দুতীর্থ যাত্রীদের শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে আরবে হজ করতে গেলে প্রধানত হিন্দু জনসাধারণের টাকায় হজযাত্রীদের ভর্তুকি দেওয়া হয়। এবারে একটু ভুল সংশোধন এই হয়েছে যে, আগের নিয়মে প্রতি পাঁচ বৎসরেই হজযাত্রীরা একবার ভতুর্কি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, নূতন নিয়মে এক ব্যক্তি সারাজীবনে একবারই এই সুবিধা পাবেন। এটা তবু মন্দের ভালো।

ভোট পেতে মুসলমান তোষণের নবতম উদাহরণ বর্তমান তৃণমূল সরকার কর্তৃক ইমামভাতা প্রদানের ব্যবস্থা। কিভাবে একটা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকার একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ইমামদেরই কেবল জনসাধারণের টাকায় পোষণ ও তোষণ করতে পারে এটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সাধারণ দরিদ্র বা পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের যদি সত্যই কোনও কল্যাণ করা হোত, তাহলে আপত্তি করার প্রয়োজন হোত না। কারণ, আমরা আন্তরিক ভাবেই চাইব ভারতের মুসলমান সমাজ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সমস্তরে এগিয়ে আসুন, তাঁদের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি হোক, যাতে তাঁদের এবং সব সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়া মানুষদের চিরকাল ভর্তুকি, সংরক্ষণ, খয়রাতের ওপর নির্ভর না থাকতে হয়। তা যে একেবারে অসম্ভব নয়, তার কিছু কিছু লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে।

অতি সম্প্রতি মুসলমানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দারুল উলম ঘোষণা করেছেন যে, কোরাণে মুসলমান পুরুষের সর্বাধিক চারটি পর্যন্ত স্ত্রীলোককে বিবাহ করার যে অনুমতি দেওয়া আছে, যখন তার প্রকৃত প্রয়োজন এসে পড়ে এবং প্রত্যেক বহুবিবাহকারী পুরুষ যখন সবকটি স্ত্রীকে সমান চোখে দেখতে পারে। সেটা কার্যত অসম্ভব। সেজন্য মুসলমান পুরুষদের একটিমাত্র স্ত্রীকে বিবাহ করাই উচিত। এই নির্দেশ সঠিক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন।

এই প্রগতিশীলতার মনোভাব যখন ইসলামী সমাজের মধ্য থেকেই আসতে আরম্ভ করেছে, তখন বর্তমান তৃণমূলী রাজ্যসরকার চেষ্টা করছে মুসলমানদের আবার মোল্লাতন্ত্রের কবলে নিক্ষেপ করতে। যার একটি দুষ্ট পদক্ষেপ হলো, ইমামদের জন্য বিশেষ দানসত্র খোলা। এই সরকারী কার্যটি প্রথমত নির্লজ্জ ভোটবাদী রাজনীতি, স্পষ্ট সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, সংবিধানে নির্দেশিত ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের বিপরীত এবং জনগণের অর্থের নির্লজ্জ অপব্যয়। কোনও যুক্তিতেই এই পদক্ষেপ মুসলমানদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তোষণনীতি কংগ্রেসের অস্থিমজ্জায় জড়িত থেকে ভারতের সমূহ অমঙ্গল করেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলী সরকার সেই রাস্তাতেই হাঁটছে এই রাজ্যে অমঙ্গল ডেকে আনার জন্য।

কোনও কোনও মহল এমন কথাও বলেছে যে, হিন্দু পুরোহিতদেরও অনুরূপ ভাতা দেওয়া উচিত। এই চিন্তা ঠিক নয়। হিন্দু সমাজ কখনও বলবে না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অন্য ধর্মের লোকেদের হীনদশার প্রত্যুত্তরে হিন্দুপ্রধান ভারতে অহিন্দুদের সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। হিন্দু সমাজ ভারতে সমস্ত সম্প্রদায়ের সমান অধিকার চায়, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নয়। তাই আমাদের দাবী ওই লজ্জাজনক ইমামভাতা বন্ধ করা, হিন্দু পুরোহিতদের জন্য পুরোহিতভাতা চালু করা নয়।

জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ

অমলেশ মিশ্র

জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষ ভারতীয় মনীষাদের কোনও অস্বচ্ছতা ছিল না। সে মনীষার নাম বঙ্কিম বা রামমোহন, শরৎচন্দ্র বা আম্বেদকর, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল, যাই-ই হোক না কেন। অনেকেই এই প্রসঙ্গে অল্প বিস্তর লিখেছেন বটে কিন্তু তার থেকেও কাজে কর্মে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রেখেছেন। জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি বর্তমানে বহুল প্রচলিত এবং কথায় কথায় উল্লিখিত শব্দগুলির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যায় তাঁদের কাছে কোনও ধন্ধ বা বৈকল্য ছিল না। এই শব্দ যে এককালে দেশে এত বিপত্তি সৃষ্টি করার ক্ষমতা সম্পন্ন, সম্ভবতঃ এ কথা তাঁদের মাথাতেই আসেনি। ধরুন এই ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির কথাই। যাঁরা ভারতবর্ষের সংবিধানে প্রণয়ন করেছিলেন তাদের মাথায় একথা আসেনি যে সংবিধানে এই কথাটির বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতের তৎকালীন মনীষীরাই ভারতের সংবিধানে রচনা করেছিলেন। তাঁরা জানতেন যে মানুষের দেহে রক্ত আছে একথাটি ‘দেহ’ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন নাই তেমনি ভারতবর্ষ যে ধর্মনিরপেক্ষ তা বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন নাই। ‘বৃত্ত’ অর্থেই গোলাকার। তাই ‘গোলাকার বৃত্ত’ এই শব্দ প্রয়োগ বাতুলতা তো বটেই এমনকী মূর্খতার পর্যায়েই যায়। অথচ পরবর্তী ভারতীয় মনীষাগণ মনে করলেন যে, ভারতবর্ষ যে ধর্মনিরপেক্ষ একথাটি বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন আছে। তাই তাঁরা সংবিধানে সংশোধন করে, সংবিধান প্রণীত হওয়ার ২৫ বছর পরে বললেন যে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্ম এবং নিরপেক্ষতা শব্দ দুটি যারা বোঝে না, তাদের পক্ষে সংবিধান সংশোধন করে বলতেই হয় যে ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু তাঁরা মনীষী। বাংলা ভাষায় ‘মনীষী’ শব্দের দ্যোতনায় ও ব্যঞ্জনায় যে অধঃপতন লক্ষ্য করা যায়, সম্ভবতঃ অন্য কোন বাংলা শব্দের এতটা অধঃপতন হয়নি।

হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। মত পরিবর্তন হলে জাতির পরিবর্তন হয় না। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকেই একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয়তা বলতে এই হিন্দু জাতীয়তার কথাই বলেছেন। যে হিন্দু শব্দটিকে খৃস্টান বা মুসলমান শব্দের সঙ্গে তুলনা করে একটি সম্প্রদায় ভেবে নিচ্ছি, হিন্দু সে অর্থে কোনও সম্প্রদায় বোধক শব্দ নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু প্রবন্ধেই জাতীয়তাবাদ জাতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ বলেছেন। নেশন শব্দটির ব্যাখ্যায় তিনি রেনাঁর মতামতের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব মনীষা-প্রসূত চিন্তায় বলেছেন— নেশন একটি সজীব সত্তা। একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এর অন্তঃপ্রকৃতি গঠন করেছে। তার একটি অবস্থিত অতীতে আর একটি বর্তমানে। একটি সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি। একত্রে বাস করবার ইচ্ছা। যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হয়েছে তাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করার ইচ্ছা। প্রাকৃতিক সীমা বিভাগ নেশনের একটি হেতু, কিন্তু ভূখণ্ড বা ভাষা নেশন গঠন করে না। ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, একটি মানসিক পরিবার।

জাতীয়তাবাদ শব্দটি এখন কিছু বিপত্তি তৈরী করছে। তার কারণ এখন ‘পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর’, তত্ত্ব আমাদের গ্রাস করেছে। ঘর ও বাইরের মধ্যে, আপন ও পর-এর মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তা উলটা পালটা হয়ে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ এত কিছু লিখেছেন কিন্তু সরাসরি জাতীয়তাবাদ নিয়ে কোনও প্রবন্ধ রচনা করেননি। তবে একটি বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ নাই যে তিনি চূড়ান্ত দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ঘোরতর জাতীয়তাবাদী ছিলেন যদিও বিদেশ এবং বিদেশী দ্রব্য সম্পর্কে তার অসূয়া ছিল না এবং চরকা ও চরকালাঞ্ছিত পতাকার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা থাক না থাক, উৎসাহ ছিল না।

দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ এবং অনাদিকাল থেকে এদেশে বসবাসকারী সনাতনপন্থীদের কৃতিত্ব, মেধা, বৃত্তি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গভীর শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি অতি প্রাঞ্জলভাবে তা

লিখেও গেছেন। হিন্দু শব্দটি তাঁর কাছে সম্প্রদায় বোধক ছিল না— ছিল একটি জাতিগত পরিণাম।

জাতীয়তাবাদ কোন বাইরের বিষয় নয়— আত্মশক্তির (জাতির এবং নিজের) সঙ্গে জাতীয়তাবোধ ওতপ্রোত। এই আত্মশক্তির ভিত্তি দেশ, পূর্বপুরুষদের স্বার্থত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রতি, দেশজ পরম্পরার প্রতি এবং দেশের যা কিছু ভাল তার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন।

যে ঐক্য সূত্রের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সেই ঐক্য সূত্রটি হলো ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ। যাকে আমরা হিন্দুত্ব ধরে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বলে নিজেদের মূর্খতা, মূঢ়তা ও অজ্ঞানতা প্রকাশ করি। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ যে হিন্দুত্ব এবং হিন্দু সংস্কৃতি ভিত্তিক রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাতেই তা প্রকাশ পেয়েছে।

যাঁরা কৌটিল্য পড়েননি, কেবলমাত্র ল্যাস্কি প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ে ভারতের জাতীয়তাবাদ বুঝতে চান এবং তার ভিত্তিতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে বলেন যে জাতীয়তাবাদ-এর উন্মেষ এবং চিন্তা ইংরাজদের ভারত দখলের পরই এদেশে হয়েছে— তাঁরা ভুলে যান বা হয়ত জানেনই না যে— ভারত রাষ্ট্রপ্রধান দেশ ছিল না, সমাজপ্রধান দেশ ছিল। এই ভারতীয় সমাজে প্রত্যহ প্রাতে যে মন্ত্রগুলি গীত হোত তা এই জাতীয়তাবাদেরই, অখণ্ডতারই, যখন বলা হয়—

গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরী সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু
কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করানি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তীহ।।

এতো গেল সাধারণ মানুষের কথা। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, আসাম থেকে আফগানিস্থান যে বৈদিক মন্ত্র পণ্ডিতেরা উচ্চারণ করতেন তা ভারতের জাতীয়তাবাদ ও অখণ্ডতার স্তোত্র। এগুলি বুঝতে ল্যাস্কি, মিল, ডানিং-এর দরকার হয় না। তাদের পক্ষে সমাজ প্রধান জাতীয়তা বোঝাও সম্ভব ছিল না। তারা যে ব্যবস্থায় অতীত এবং বর্তমান কাটিয়েছিলেন— তা রাষ্ট্রপ্রধান ব্যবস্থা। রাষ্ট্রপ্রধানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। মিশর, রোম, গ্রীস, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া সব দেশেরই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও ব্যবস্থা রাষ্ট্রপ্রধান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীতে ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ যাকে আমরা সহজ ভাষায় হিন্দুত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বলতে পারি, সেই জাতীয়তাবাদ আলেকজান্ডার থেকে মহম্মদ ঘোরী পর্যন্ত দেড় হাজার বছর বিদেশী হানাদারদের ঠেকিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ চিনতে পেরেছিলেন ভারতের জাতীয়তাবাদের এই চরিত্রকে। তাইতো লিখলেন--- অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধান দেশে জাতীয়তাবাদ ব্যাপারটা স্বোপার্জিত। সমাজ প্রধান ভিত্তিক ভারতবর্ষে জাতীয়তা একটি পাকাপোক্ত পরিচয়— যার নড়চড় হওয়ার উপায় নাই।

আমরা আমাদের এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের পরিচয়টাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। এখানে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা খাটে না। আমার মানা বা না মানাও খাটে না।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও সম্প্রদায় দুটি ধারণাকে পৃথকভাবে দেখেছেন। সমাজ একটি বিশাল বিষয়। সম্প্রদায় কখনও সমাজের স্থান গ্রহণ বা পূরণ করতে পারে না। তিনি বলেছেন— 'আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? তবে কি মুসলমান অথবা খৃস্টান সম্প্রদায়ের যোগ দিয়াও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্র নাই। ইহা সত্য যে কালীচরণ বাড়ুজ্যমশায় হিন্দু-খৃস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খৃস্টান। খৃস্টান তাহাদের রঙ, হিন্দুই তাহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দুও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনও বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না।'

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকেই একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয়তা বলতে এই হিন্দু জাতীয়তার কথাই বলেছেন। যে হিন্দু শব্দটিকে খৃস্টান বা মুসলমান শব্দের সঙ্গে তুলনা করে একটি সম্প্রদায় ভেবে নিচ্ছি, হিন্দু সে অর্থে কোনও সম্প্রদায় বোধক শব্দ নয়।

রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন যে ভাষা বা ভূখণ্ড কোনও জাতিগঠনের মূল শক্তি নয়। জাতি বিশেষের জীবন কোনও নির্দিষ্ট ভাবের মধ্যে থাকে। সেইখানেই সেই জাতির জাতীয়ত্ব। হিন্দু সেই অর্থে একটি জাতিগত পরিণাম।

বিবেকানন্দ বলেছেন, (লাহোরে ধ্যান সিং-এর হাবেলীতে প্রদত্ত বক্তৃতা) আমাদের দেশে ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, কতকগুলি সাপের মাথায় মণি আছে— তুমি সাপটিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু যতক্ষণ উহার মাথায় ওই মণি থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কোনও মতে মারিতে পারিবে না। আমরা রাক্ষস রাক্ষসীর অনেক গল্প শুনিয়াছি। রাক্ষসীর প্রাণ একটি একটি ছোট পাখির ভিতর থাকিত। যতদিন ওই পাখিটাকে মারিতে না পারিতেছে, ততদিন সেই রাক্ষসীকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলো, তাহাকে যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু রাক্ষসী মরিবে না। জাতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। মানব জাতির মন যে সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম বিষয়— দর্শন ও ধর্মই জ্ঞানের জগতে ভারতের মহৎ দান।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তা বলতে সম্ভবতঃ বিবেকানন্দের উল্লিখিত ওই সাপের মণি বা রাক্ষসীর প্রাণ ভোমরাই বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ-এর শ্রদ্ধা ও বিশ্লেষণ এই কথা সাক্ষ্য বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু লিখে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন এমন কিছু আমার জানা নাই। তবে তিনি যে ১০০ ভাগ জাতীয়তাবাদী ছিলেন সে বিষয়ে কোনও রবীন্দ্রবিদ্বেষীরও সন্দেহ নেই।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

কৌতুকপ্রিয় হিমানীশ

চণ্ডী লাহিড়ী

হিমানীশ চলে গেলেন। একলা হয়ে গেলাম। ইংরেজি জানা, দেশবিদেশের রঙ্গব্যঙ্গের খবর রাখা মানুষটি আর নেই। কার সঙ্গে লড়বো! স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমরা রিং-এর মধ্যে যতক্ষণ ততক্ষণ আমরা প্রতিযোগী, বাইরে নো কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। আমি কটূক্তি হয়তো করেছি, হিমানীশ পাল্টা উত্তর দেয়নি। কারণ সে পরিমল গোস্বামীর ছেলে। তার সম্মান হারাবার ভয় আছে।

তখন আমার শূন্য কুম্ভ অতএব সেটা বেশি বাজে। গ্রামের ছেলে চেঁচিয়ে কথা বলি। হিমানীশ লন্ডন ফেরৎ। স্বভাববিনয়ী। হিমানীশের উচ্চকণ্ঠ শুনেছি মনে পড়ে না। কেউ প্রতিবাদ করলে চুপ করে থাকে।

রবীন্দ্র সদনের ঘটনাটি একালের পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই। টিকিট কেটে অনুষ্ঠান হচ্ছে। এক ফিল্মস্টার আসবেন। সেজন্য দর্শকরা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অনুষ্ঠানের পরিচালক রেডিওর বিখ্যাত পার্থ ঘোষ। আমি আর হিমানীশ মঞ্চে পাশাপাশি। হিমানীশকে পার্থবাবু ডাকলেন—অনুষ্ঠান শুরু করতে। মাইক থাকলেও অনুচ্চকণ্ঠে হিমানীশ শুরু করলেন হাসির ঘটনা বলতে। দর্শকরা কিছুক্ষণ শুনেই চেঁচামেচি শুরু অর্থাৎ প্যাঁক দেওয়া আরম্ভ করল।

পার্থ ঘোষ-গৌরী ঘোষ দম্পতি সংস্কৃতি জগতের পুরোধা। সারা বাংলা তাঁদের চেনে। যোগ্য মানুষের কিভাবে সমাদর করতে হয় সেটা বিলক্ষণ জানেন। সঞ্চালক পার্থবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এবং স্পষ্ট গলায় একরাশ প্যাঁক দেওয়া দর্শকদের উদ্দেশে বললেন— আপনারা টিকিট কেটে শো দেখতে এসেছেন। যদি হিমানীশদার কথা ভাল না লাগে তবে হলের বাইরে চলে যান। প্রয়োজনে টিকিটের দাম ফেরত নিতে পারেন। হিমানীশদা বয়সে প্রবীণ, অনেক অভিজ্ঞতা তাঁর। শুনলে আমরাই লাভবান হবো। আর যাঁরা ফিল্মস্টার দেখে ধন্য হতে চান তাঁরা এখন যান। পরে স্টার এলে ভিতরে আসবেন।

ঘটনাটি বহুদিনের। আমরা ঘরে যখন বুড়ো-বুড়ি একলা থাকি, ঘটনাটির চর্বিত চর্বণ করি। হিমানীশ অনেক মজার মজার ঘটনা সেদিন বলেছিলেন। দর্শক মন দিয়ে শুনেছিল। পরের বক্তা আমি। হিমানীশের জন্য আমি প্যাঁক খেলাম না।

আর একটা মজার ঘটনা বলি। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের একদল তরুণ ছাত্র সে সময় শক্তি-সুনীলের কবিতার অন্ধভক্ত। এদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে আর একজন বোহেমিহান হিমানীশ। মেডিকেল ছাত্রদের রি-ইউনিয়ন। কথা ছিল শক্তি সুনীল এবং হিমানীশ উপস্থিত থাকবে উৎসবে।

নির্দিষ্ট দিনে সকালবেলা দেখা গেল—শক্তি নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সুনীল সভাসমিতিতে যাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এবং সবাই জানে, সে কোথাও না কোথাও পালাবে। কম বয়সে বেশি জনপ্রিয় হলে এমন মিথ্যা ভরসা দেওয়া ছাড়া গতি নেই। এন আর এসের ছেলেদের মাথায় হাত। ধরা পড়ে গেল হিমানীশ। সে সভাসমিতিতে ভয় পায়। তাকে পাওয়া গেল, দাবা প্রতিযোগিতার আসরে। সেখান থেকে আমায় ফোন— আমায় বাঁচাও। সভাসমিতির মধ্যে আমি নেই। ওসবে ভয় পাই।

—শক্তি কোথায়?

—সন্ধ্যাবেলা শক্তি কোথায় থাকে কেউ জানে না। হিমানীশের দোষ নেই। মেডিকেল ছাত্রদের রি-ইউনিয়নের এই অনুষ্ঠানের শিরোনাম—Social participation in medical practices। সমাজ ডাক্তারদের সম্পর্কে কি ভাবে তা নিয়ে আলোচনা।

সে সময় অবশ্য 'রোগী মরলেই ডাক্তার মারো' নিয়ম ছিল না। ডাক্তারবাবুরা খুবই সামাজিক ছিলেন। ক্যানসার স্পেশালিস্ট ডাঃ জয়ন্ত সেন তো কবি শিল্পীদের সঙ্গে রীতিমতো আড্ডা দিতেন। হিমানীশ দাবা অন্ত প্রাণ। রাশিয়ান দূতাবাসের উদ্যোগে দাবা নিয়ে যে আলেখিন দাবা এরাজ্যে খুব হৈ চৈ ফেলে দেয়, অনেকেই জানে না তার মূলে ছিল হিমানীশের উদ্যোগ। একটা সময় এসেছিল যখন হিমানীশকে বাদ দিয়ে দাবার কথা ভাবাই যেত না। দাবা ঠাণ্ডা মাথার খেলা। শক্তির মতো অতি চঞ্চল, শৃঙ্খলাবর্জিত মানুষের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার মধ্যে কেউ যেন বৈপরীত্য খোঁজার চেষ্টা না করেন।

হিমানীশ গোস্বামী

কাল আমার সারা রাত ঘুম হয়নি জানো? বিজনবাবু সকালেই আমার বাড়িতে বসে এক কাপ চায়ের সঙ্গে কথাটা পাড়লেন। আমি বললাম, আমিও ঘুমুতে পারিনি দাদা। আদার দাম যা বেড়েছে আজকাল, তা আর কহতব্য নয়।

---আদা? আদার দাম বেড়েছে নাকি আজকাল? বিজনবাবু একটু ব্যথিত হন যেন। হুঁ— তিনি বলতে থাকেন, আমি তো ভেবেছি তুমি আদার খোঁজ টোঁজ রাখ না! তুমি না জাহাজের ব্যাপারী?

—কি ব্যাপার? আমার জিজ্ঞাস্য।

—না, ব্যাপার নয়, ব্যাপারী। তুমি না জাহাজের ব্যাপারী সেকথাটাই জানতে চাইছিলাম।

—তা বলতে পারেন বটে। আমি শিপিং করপোরেশনে কাজ করি। তা ডাঙাতেই আমার কাজ, ডিঙিতে নয়। ডিঙি কিংবা জাহাজ আমার আদপেই দেখা হলো না এ জীবনে।

—সে কি কথা? বিজনবাবু বলেন, বল কি হে। তুমি জীবনে ডিঙি বা জাহাজ কিছুই দেখনি?

—কি করে দেখব বলুন। ফুরসত কোথায় আমার? সকালে উঠেই বাজার ছোটো, তার পরই খেয়ে দেয়ে এসে বড়বাজারে ছোটো।

—বড়বাজারে ছোট? সেটা আবার কি কাণ্ড? বিজনবাবুর কথাটা আর্তনাদের মতই শোনায়।

—আহা, আমি জানাই। আমার অফিস তো ওই বড়বাজারেরই ধারে কাছে কিনা। সেখান থেকে জাহাজও দেখতে পাই না, ডিঙিও না। ওখানেই আমি ছুটি— মানে যখন অফিসের কাজ তখনই ছুটি।

---তা তোমাদের অফিস ঘরে জানলা-টানলা নেই?

শিবরাম চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

—তা থাকবে না কেন? জানালা অনেক আছে— হরদমই তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

— তা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায় না?

—না: আমি বলি। গঙ্গা দেখা যায় না। দেখা যায় ঠিক আমাদের বাড়ির মতো আর একখানা বাড়ি। আর সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেই বাড়ির জানালাগুলি।

—হুঁ! বিজনবাবু বলেন, জানালা দিয়ে কি দেখা হয় শুনি? বাড়ির অন্দরমহলে চোখ পড়ে তোমার, তাই তোমার সকাল সকাল হন্তদন্ত হয়ে অফিস পাড়ায় অমন ছোটাছুটি! বুঝেছি— এবার, আর বলতে হবে না। জানালা দিয়ে জানানা দেখাই তোমার নেশা। সেই জন্যই তোমার জাহাজ ডিঙি কিচ্ছু দেখা হয়নি। ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে জানালা দিয়ে জানানা দেখা হচ্ছে তোমার নেশা, কিংবা পেশা?

আমি বললাম, মোটেই না। আমার অফিসের জানালা দিয়ে জানা অজানা কোনও জানানাকেই দেখতে পাই না— দেখতে পাই আরও জানালা। তার ভেতর দিয়ে চোখের দৃষ্টি আর ভেতরে সেঁধোয় না। আর তা ছাড়া যতক্ষণ অফিসে থাকি ততক্ষণ ঘাড়টি টেবিলের উপর গুঁজে কাজ করতে হয়। চারদিকে যে তাকাব তার ফুরসুতই পাই না।

—কেন টিফিন, টিফিনের সময়টা কি করো?

—টিফিনের সময় আমরা তো তাসে বসে যাই। আমি, গৌরীপদ, কেষ্টপদ আর ছিরিপদ। দারুণ ফ্লাশ খেলতে থাকি। এক একদিন শ' দেড়েক টাকারও বেশি যোগ-বিয়োগ হয়ে যায়। তবে টিফিন পিরিয়ড থেকে শুরু হয়ে রাত বারোটাও হয়ে যায় কখনও কখনও। কখনও আবার সারারাতও চলে!

—তোমার এই গুণপনা তো আমার জানা ছিল না?

—তা ছিল না। আমি কি কাউকে বলেছি নাকি এসব। এসব কথা কি কাউকে বলার? এসব বলার দরকার কি? মানে, বলাই বাহুল্য নয় কি? সরকারী অফিসে-টফিসের আনাচে

কানাচে সকলেই জানে জুয়া চলে। সেকথা ঢাক পিটিয়ে বলার কি? তাছাড়া, যতক্ষণ জুয়া চলে ততক্ষণ তো ওভারটাইমও মেলে। ওভারটাইম না হলে এই বাজারে চলে?

—তা বটে, ওভারটাইম না হলে চলবে কেন? তা ঢাক পিটিয়ে বলারও নয়—মেনে নিলাম। তবে কিনা, এটা আমাকে বল ভাই তুমি জাহাজের ব্যাপারী হয়ে আদার খোঁজ রাখ কেন?

আমি বললাম, বিজনবাবু আপনি ভুলে যাচ্ছেন— আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজের দরকার কি, এমন কথাই বাজারে প্রচলিত, কিন্তু কেন তা আমার মাথায় ঢোকে না, আজ পর্যন্ত ঢোকেনি কখনও। আদার ব্যাপারীরা জাহাজের খোঁজ রাখতেই পারে— যদি সেটা আদার জাহাজ হয়।

বিজনবাবু বললেন, আদার জাহাজ? আদার লরি বলতে পার। আদা তো শিলিগুড়ি অঞ্চল থেকেই চালান আসে। আসে না কি? তা সেখান থেকে জাহাজে করে কি কেউ আনে? আদার রেলও বলা যায়।

—তা বটে। আমি বললাম। তবে কিনা জানেন বিজনবাবু— ধরুন আপনি রয়েছেন নিউইয়র্কে। সেখানে তো আদার জন্য আদার ব্যাপারীকে জাহাজের দিকেই লক্ষ্য করে বসে থাকতে হয়?

কথাটা নিয়ে বিজনবাবু ভাবতে থাকেন। বলেন, আদার ব্যাপারীদেরও তাহলে জাহাজ নিয়ে ভাবতে হতে পারে। তবে যদি কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার না করত তাহলে নিউইয়র্কও হোত না, আর সেখানকার ব্যবসায়ী আদার কথাই ভাবত না।

আমি বললাম, সে তখন আদার কথাই ভাবত। আদার এর ইংরিজী রূপ যা, তার অর্থ হলো আর সব।

বিজনবাবু বললেন, আর এক কাপ চা হবে?

আমি বললাম, হবে না কেন? চায়ের ব্যবস্থা পট করেই করা যায়। পটে করে চা এনে হাজির করি আমি।

বিজনবাবু এবার হাই তুললেন।

বললাম, হাই টাইম?

বিজনবাবু বললেন, হাই টাইমটা কি বস্তু?

আমি বললাম, কে জানে কি বস্তু। তবে ইংরেজী সিনেমায় কথাটা বহুত চালু থাকতে দেখেছি। আমার মনে হয় হাই তুলবার যে সময় তাকেই বলে হাই টাইম। মনে হয় ঘুমনোর আগের সময়কে সাহেবরা এই নাম দিয়েছে।

বিজনবাবু বললেন, হাই তুলবার কি সময় আলাদা করা থাকে নাকি? আমি বললাম, আমাদের হয়ত থাকে না, কিন্তু সায়েবদের থাকতে পারে।

—কেন? বিজনবাবুর প্রশ্ন।

—কেননা তাদের কথাই আলাদা।

বিজনবাবু বললেন, তা কথাটা বলেছ ঠিকই। ওদের কথাই আলাদা। আমরা যেখানে বলি গুড, ওরা তাতে বলে ভাল।

আমি বললাম, আর দেখুন ওরা যখন বলে সং— আমরা বলি গীত। উচ্চারণে কতই না তফাত। আবার দেখুন দুই বিপরীতকে মিলিয়ে দিন, সং এর সঙ্গে গীত দিয়ে সঙ্গত করুন, দেখবেন তাই হয়ে পড়েছে সঙ্গীত।

বিজনবাবু একটু যেন বিচলিত বোধ করেন। বলেন, চমৎকার বলেছ হে। কিন্তু কি যেন কথা হচ্ছিল আমাদের? মানে, আমি কি জন্য এখানে এসেছিলাম, আমার প্রথম কথাটা কি ছিল তাই আমি মনে আনতে পারছি না।

আমি মনে করিয়ে দিই। আপনার গত রাত্রে ঘুম-টুম হয়নি একথাই আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন প্রথমেই। তারপর আমিও আমার দুঃখের কাহিনী গেয়েছিলাম— ঘুম আমারও হয় টয়নি। তবে আপনার কেন ঘুম হয়নি সেটা জানার জন্য আমার কৌতূহল বিশেষ হয়নি এটা ঠিকই।

বিজনবাবু বললেন, না— এসব বিষয়ে কৌতূহল না থাকাই ভাল। সেটাই ভদ্রতার লক্ষণ। তবে আগ্রহ থাকার দরকার ছিল। আমার কেন ঘুম হয়নি সে নিয়ে তোমার একটা ছোট্ট সহানুভূতি সূচক প্রশ্নও আমাকে তৃপ্তি দিত। তুমি তো একটুখানি আগ্রহও দেখালে না ভাই।

আমি বললাম, অন্যের ঘুম কেন হয় না তা জানতে আমার আগ্রহ স্বভাবতই হয়নি— কেননা, আমার নিজেরও ঘুম হয়নি কাল সারা রাত।

হুঁ। বিজনবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আজকাল হয়েছে ওই মুসকিল— যাকে যা বলতে যাই, মানে— আমার দুঃখের কথা, অন্যেরা তার দশগুণ আমাকে শুনিয়ে দেয়। সেদিন সুরেন বিশ্বাসকে বলতে গিয়েছিলাম অন্ধকারে আমার নিদারুণ কষ্টের কথা। লোডশেডিং-এর ফলে আমার যে উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়েছে— আগে যেখানে আমি ঘণ্টায় পনেরো খানা পরীক্ষার খাতা দেখতাম হেলায়-ফেলায়, এখন বলা নেই কওয়া নেই লোডশেডিং-এর ফলে দুম দাম সব অন্ধকার হয়ে যাওয়ায়, কিংবা আলো নিভে যাওয়ায়, অথবা দুই-ই এক সঙ্গে ঘটে যাওয়ায় আমার খাতা দেখার গতি কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় চৌদ্দখানা। অর্থাৎ কিনা আমার আয় কমে গিয়েছে কত তা ভেবেই দেখতে পার। এদিকে সুরেন বলে তার নাকি পেটে আলসারই হয়ে গেছে লোডশেডিং-এর ফলে। এসব কথা কখনও ভেবেছ?

আমি ভেবে দেখলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না।

—আপনি খাতা প্রতি কত করে পান? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সাতাশী পয়সা।

—দিনে ক' ঘণ্টা আপনি খাতা দেখেন?

বিজনবাবু বললেন, খাতার মরশুমে, তা ভাই গড়ে ঘণ্টা দুয়েক।

আমি খাতা আর একটা বলপয়েন্ট নিয়ে বসলাম।

বললাম, আর যখন মরশুম না থাকে?

বিজনবাবু বললেন, তখন কোনও ঝামেলা নেই। তবে ছাত্র পড়াতে অসুবিধে হয় তখন। আমার আবার তেত্রিশ-জন ছাত্র।

—তে-ত্রি-শ জন! আমি প্রায় আকাশ থেকে পড়ি। বিজনবাবু বলেন, হ্যাঁ আপাতত তেত্রিশজন। তবে পরীক্ষার আগে এই সংখ্যা ডবল হয়ে যায়।

আমার বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

বলি, আপনার এত ছাত্র। ছাত্র প্রতি আপনার কত আয়? আপনি প্রায় একজন ছত্রপতিই বলা যায়।

বিজনবাবু বলেন, এইসব দারুণ দারুণ ইনফ্লেশানের বাজারে ছাত্রপতি আমার রেট কমই বলতে হয়। সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে অঙ্ক হলে চল্লিশ টাকা, আর দু' ঘণ্টা হলে পঁচাত্তর। এটা আমার বাড়িতে এসে পড়লে, আর ছাত্রদের বাড়িতে গিয়ে পড়ালে একশো টাকা এবং দেড়শ টাকা।

—অ্যাতো টাকা! আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি। প্রশ্ন করে অবাক হই। তাহলে মাসে তো আপনার আয় ধরুন গিয়ে দু' তিন হাজার।

বিজনবাবু বলেন, দু' তিন হাজার নাকি।

তাহলে অনেক টাকাই হবে না? আমি তো গুণি টুনি না। ওসব টাকা আমি হাত পেতে নিই বটে, কিন্তু তারপর গিন্নীর কাছে সেটা দিই। তাকেও গুণতে বারণ করে দিই।

—উনিই তাহলে ওই টাকায় সংসার চালান?

—না, উনি ওই টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে যান, সেখানে খুচরো খুচরো টাকা জমা দিয়ে বড় বড় নোট বানিয়ে নেন। তারপর সেই নোটগুলো নিয়ে যান গয়নার দোকানে, সেখানে নোটের বদলে গয়না নেন।

—তারপর বাড়িতে চলে আসেন?

—না। তারপর তিনি চলে যান আবার ওই ব্যাঙ্কে। সেখানে রয়েছে সেফটি ভলট। মানে পুরু লোহার সিন্দুক। সেখানে গয়না-টয়না সব রেখে চাবি মেরে চলে আসেন।

—তাহলে আপনার সংসার খরচ কোত্থেকে আসে?

বিজনবাবু বললেন, সংসার খরচ আসে স্কুলের মাইনে থেকে, আর উপরি থেকে।

—স্কুলের মাইনে তো কমই শুনতে পাই আমি।

—তা যা বলেছ ভাই। হাতে সর্ব সাকুল্লে পাই আটশো বাহান্ন টাকা।

—আর উপরিটা কোত্থেকে আসে?

—কোশ্চেন আউট করে বছরে হাতে এসে যায় কিছু। এক একটা কোশ্চেন আউট করি আর দুশো টাকার মতো পাই। একবার কুড়িটা কোশ্চেন আউট করতে পেরেছিলাম বিভিন্ন সাবজেকটের। সেবার দর ভাল পেয়েছিলাম, হাজার টাকা করে প্রতি কোশ্চেনে। কোশ্চেনের এই ব্যাপার শুনে আমার উত্তর যোগায় না। চুপ করে থাকি।

বিজনবাবু বলেন, উপরি আরও আছে। টেস্টে অ্যালাউ না হলে ছেলেরা বাঁদরামি শুরু করে। অভিভাবকরা এসে তারপর হাতে পায়ে ধরে। কি করি তাদের কষ্টে আমার হৃদয়ও গলে যায়। তারপর তাঁরা যখন আমার পকেট ভর্তি করে নোট দিয়ে যান, তখন তাঁদের ছেলেদের নাম নোট করি। হেডমাস্টার মশাইকে তখন ভুলিয়ে ভালিয়ে অ্যালাউ করাবার ব্যবস্থা করি।

—কিন্তু এ তো অন্যায়! আমি গর্জে উঠি।

—অন্যায়? বিজনবাবু হাসেন। অন্যায়টা কোথায় দেখলে তুমি, অ্যাঁ? তুমি কি ভেবেছ আমি সব টাকাই মেরে দিই? হেডমাস্টার মশাই-এর ড্রয়ারে ছাত্র পিছু কিছু রাখতেই হয় আমাদের। নইলে হেডমাস্টার মশায়ের চলবে কেন বলো? তিনিও তো একজন সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি! তা তাঁরও তো সংসার রয়েছে, স্ত্রী পুত্র, কন্যা, আশ্রিত রয়েছে।

—কিন্তু দারোয়ান? বেয়ারা? এদের কথা? এদের কথা আপনি ভাবেন না তো?

—তুমি কোথায় আছ ভাই? ওদের কথা আমরা ভাবি না, তাই তুমি বলতে চাইছ? ওদের কথা না ভাবলে উপায় আছে? লাইব্রেরিয়ান, দফতরি, ঘণ্টাবাদক এঁদের কথাও আমাদের ভাবতে হয় বই কি। লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরীর বই কিছু বেচে দেন, তাতে তাঁর কিছু আয় হয়—কিন্তু সে অতি সামান্য। আমাদের স্কুলের ছাত্র পিছু বছরে দশ টাকা নেওয়া হয় লাইব্রেরির জন্য— তা তিন হাজার ছাত্রের জন্য ওঠে ত্রিশ হাজার, এর পর আবার নানান লোকের দান আছে, বছরে ওই লাইব্রেরিতেই খরচ করার কথা হাজার পঞ্চাশেক। তা বই কেনা হয়, বাঁধাই হয়। ওই সময় সকলেই কিছু না কিছু পেয়ে যান।

—কি রকম?

—ওই সময়, মানে বই কেনবার সীজনে চেনা দোকান থেকে হাজার হাজার টাকার ক্যাশমেমো জমা দেওয়া হয় স্কুলে, আর বার করে নেওয়া হয় টাকা। আবার ওই বই বাঁধাই-এর ক্যাশমেমোও জমা দিয়ে টাকা পাওয়া যায় কিছু। সেই টাকা ভাগাভাগি হয় হেডমাস্টার, লাইব্রেরিয়ান, দফতরি আর বেয়ারাদের মধ্যে।

—কেন হেডমাস্টার ভাগ নেন?

—বাঃ উনি হেডমাস্টার তো! ওঁকে তো ভাগ দিতেই হবে, নইলে সব হিসেব-টিসেব ধোপে টিঁকবে কেন? তাছাড়া তাঁর একটা বড় খরচ আছে না?

—কি রকম?

—অডিট করার সময় অডিটরদের দারুণ পান ভোজ করাতে হয় না। অডিটরদের টিট করতে হলে রূপোর ছিটে ফোঁটা তাঁদেরও দিকে বাড়াতে হয়।

—কেন?

—নইলে অডিট রিপোর্ট সুষ্ঠু হবে কেন?

এসব কথা শুনে আমার বাক্য যেন আর সরতে চায় না। আমি বলি, এতসব ব্যাপার

আমাদের আশেপাশেই ঘটছে আর আমরা জানিই না।

বিজনবাবু সেদিন খুবই মুড-এ ছিলেন। বললেন, এরপর আরও সব ব্যাপার আছে। ধরো, আমাদের স্কুলে বাস রয়েছে পোনেরো খানা। মানে খাতায় পত্রে তাই রয়েছে। এক হাজার ছেলের কাছ থেকে বাস ভাড়া আদায় করা হয় মাসে পঞ্চাশ টাকা। তাদের দশ খানা বাসে ছাগলের মতো নিয়ে যাওয়া হয়, নিয়ে আসা হয়। গরমকালে তাদের ঘেমে নেয়ে উঠতে হয়। এক একখানা বাসে এক সঙ্গে একশো জনকে বোঝাই করা হয় গড়ে। তাদের কষ্ট দেখলে আমাদেরও মাঝে মাঝে কষ্ট হয়।

আমি কিন্তু তখনও লাইব্রেরির কথা ভুলতে পারিনি। বলি, আচ্ছা লাইব্রেরির জন্য বই-এর বদলে ক্যাশমেমো যে আসে, তাতে লাইব্রেরিতে বই তো থাকে না। ছেলেরা তাহলে পড়ে কি?

বিজনবাবু বললেন, বই আছে বইকি লাইব্রেরিতে। প্রচুর বই আছে। বহু লোক মৃত্যুকালে তাঁদের বহু বই দান করে গেছেন। ভাল খারাপ সব বই। তা থেকে সব ভাল ভাল বই বেছে বাজারে বিক্রী করা হয়ে গেছে, থেকে গেছে অনেক খাজা বই। ছেলেরা সেগুলিই পড়ে। কোনও কোনও ব্যক্তি জীবিত কালেও বহু বই সজ্ঞানে দান করে গেছেন, সেগুলিরও ওই দশা।

—তা ওই বই বিক্রির টাকার সদ্গতি হয় কেমন করে?

বিজনবাবু বললেন, ওই বই বিক্রির টাকার একটা অংশ যায় পাড়ার মাস্তানদের পুজো ফাণ্ডে। নইলে দু'দিনে স্কুল উঠে যেত। আর কিছু অংশ যায় মাস্তানদের রাজনৈতিক গুরুদের ট্যাঁকে। নইলে গুরুরা চ্যালাদের অ্যাড-হক করে সরিয়ে দিত। একদল বন্ধু মাস্তানদের বদলে জুটে যেত শত্রু মাস্তান, সেটা অ্যাভয়েড করার জন্যই আমাদের এইসব ব্যবস্থা নিতে হয়। আর চ্যালারা টাকা না পেলে আমাদেরই চ্যালাকাঠ করে চিতায় তুলে দিত।

—চ্যালাকাঠের চিতায়ই তো লোককে ওঠায়, কিন্তু চ্যালাকাঠকে কেমন করে চিতায় ওঠায়, বলবেন দয়া করে?

বিজনবাবু বললেন, তা আর বলব না কেন— চ্যালাকাঠকে ঠিক চিতায় ওঠানো হয় না, চ্যালাকাঠকেই চিতায় পরিণত করা হয়।

কিন্তু— আমি কিন্তু কিন্তু করি— এসব করে শিক্ষা দীক্ষা তো তেমন হওয়ার কথা নয়?

—কেন হবে না শিক্ষা দীক্ষা? আমরা স্বাধীনতার এই তেত্রিশ বছরে— হিসেব সঠিক হলো কিনা জানি না, আন্দাজে বলছি—বত্রিশ কিংবা চৌত্রিশ বছরও হতে পারে অনেক দূর যাইনি কি? অনেক দূর গিয়েছি। আমরা এমন দেশ বাদ রাখিনি যেখান থেকে আমরা ধার করিনি, নো-হাউ সংগ্রহ করিনি। সেদিন তো ঘটা করে ভেনিজুয়েলার কারিগরী সহযোগিতায় ঘুঁটে দেওয়ার একটা প্রতিষ্ঠান খোলা হলো ডানকুনিতে।

—ঘুঁটে দেওয়ার প্রতিষ্ঠান? তার জন্য ভেনিজুয়েলার সহযোগিতার কেন দরকার? আমাদের দেশে আকছারই তো ঘুঁটে দেওয়া হয়। একটা দেওয়াল খালি রাখার জো নেই।

—আহা, সে ঘুঁটে নয়। সে তো গোবরের ঘুঁটে। কিন্তু ভ্যাড়ার গোবরের ঘুঁটের জন্যই ডাকা হয়েছে ভেনিজুয়েলার টপ টপ সব এক্সপার্টদের। তাঁরা সব আসছেন টপ টপ করে, সঙ্গে কারুর দোভাষী, কারুর সঙ্গে আবার তেভাষী!

—কেন, তেভাষী কেন?

—যারা হিন্দী জানবে, স্প্যানিশ জানবে আর জানবে...।

—ইংরেজী? আমার প্রশ্ন।

—না, ভ্যাড়ার ভাষা জানাও এ ব্যাপারে আবশ্যিক বলে মনে করেন আমাদের আচার্যদেব। নইলে তিনি তাঁর আশ্রমে অনশন ধর্মঘট করে আবারও প্রাণ বিসর্জন দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভ্যাড়ার ঘুঁটের দেনা পাউনার ব্যাপারে ভ্যাড়ারও মতামত নিতে হবে।

—আপনি বললেন, দেনা পাউনার। 'দেনা পাওনা' এই কথাটাই তো ঠিক, বলুন—ঠিক কিনা?

বিজনবাবু বললেন, না, এক্ষেত্রে তিনি 'দেনা পাউনা' এই কথাটাই বলেছেন, আমি স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছি।

আমার মাথা কেমন যেন ঝিম ঝিম করছিল। বললাম, দাদা আজ থাক। অনেক শুনে ফেলেছি— আর নয়। এটুকুই আমার সহ্য হবে কিনা কে জানে? এতেই আমি আরও দু'দিন দু' রাত্রি হয়তো ঘুমুতে পারব না। আপনি এসব কথা বলে ভাল করেননি।

বিজনবাবু খাপ্পা হয়ে উঠলেন, খাপ থেকে তরোয়ালই যেন বার করলেন একখানা। বললেন, এসব কথা বলে ভাল করিনি? এসব কথা মনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে একদিন তার বিস্ফোরণ ঘটত না? সে জন্যই আমাকে বলতে হলো। আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নটি এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

আমি বললাম, আর এখন এই সব অযাচিত তথ্য নিয়ে আমি কি করি?

বিজনবাবু বললেন, তুমি আর কি করবে— লিখে ফেল? লিখলেই তোমার মুক্তি। তোমার স্বস্তি। এবার আমি তাহলে যাই?

আমি বললাম, কোথায় যাবেন এখুনি। কাল রাত্রে আপনার ঘুম কেন হয়নি তাই তো জানতে পারলাম না। আর এক কাপ চা দিই?

—চা? তা দাও এক কাপ। কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়নি— কালীপুজোর বাজি, বোমা পটকায়।

—কালীপুজো? আমি বলি— এখন তো বর্ষাকাল। এখন দুর্গাপুজোই হলো না, কালীপুজো কোথায়?

—তাই নাকি? বিজনবাবু মাথা চুলকোতে থাকেন। তাহলে কাল সারারাত ছোকরারা অত হৈ চৈ করে বাজী পোড়াচ্ছিল কেন?

এবার আমি মাথা চুলকাই। বলি— গত মাসে উল্টোডাঙ্গার যে ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা হলো না, দু লক্ষ তেরো হাজার না কত টাকার? পুলিশ এখনও একজনকেও গ্রেফতার করেনি, সেটারই সেলিব্রেশন ছিল ওটা। আপনি জানতেন না? বোতল বোতল মদ উড়ল, কেজি কেজি মাংস আর রুটি সাবাড় হয়ে গেল। এসব খবর আপনি জানতেন না?

বিজনবাবু বললেন, অ্যাঁ? এই কারবার? সমাজটা কোথায় গেছে, কোথায় কত নিচে নেমে গেছে— দেখলে?

আমি বললাম, দেখলাম। সমাজের কথা আর বলবেন না, একেবারে গোল্লায় গেছে।

(শিবরাম চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে হিমানীশ চক্রবর্তীর এই লেখাটি স্বস্তিকা ১৩৮৭ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে তা পুনঃপ্রকাশিত হলো। অনিবার্যকারণবশতঃ প্রতিশ্রুতিমতো 'কথাবার্তা শব্দ সবই বদলে যাচ্ছে' রম্যরচনাখানি প্রকাশ করা গেল না।)

চিঠিপত্র

ইমামদের মাসিক ভাতা— পুরোহিতদের নয় কেন?

সংবাদে প্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ইমামদের মাসিক ভাতা ২৫০০ টাকা এবং তাদের সন্তানদের বাসস্থান ও শিক্ষার দায়িত্ব সরকার বহন করবেন। এছাড়া মুসলমানদের জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হজ হাউসের জন্য জমি ও অর্থ মঞ্জুর, মুসলমান মহিলাদের জন্য আলাদা কলেজ স্থাপন, মুসলিম বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা, মা-মাটি-মানুষের সরকার করে দেবেন। প্রশ্ন জাগে মুসলমানদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা কেন? প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন সবধর্মের মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করেন, তখন ওদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা কেন? প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণে ওদের অসুবিধা কোথায়? এতে কী ভারতীয় মূলস্রোত থেকে ওদের আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না? হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলা হয়, এতে কি ঐক্য সুদৃঢ় হবে? হিন্দুদের মধ্যে কি গরীব ও বেকার যুবক-যুবতী নেই? সরকার অধিগৃহীত মঠ, মন্দির ছাড়াও বহু মঠ-মন্দির রয়েছে, যেখানে মন্দির কর্তৃপক্ষ জনগণের দানের মাধ্যমে মন্দির পরিচালনা করেন। পূজারী বা পুরোহিতদের ব্যয়ভার বহন করেন, অতি কষ্টে। তাহলে পুরোহিতদের মাসিক ভাতা দেওয়া হবে না কেন? বহু পুরোহিত যাঁরা 'যাজনিক বা পুরোহিতের' কাজ করে অতিকষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন, তাঁদের কথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবারও ভাবলেন না। সত্যি আমরা কোন রাজ্যে বাস করি! কী বিচিত্র আমাদের 'রাজনৈতিক চরিত্র'! বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীকে 'খুশি রাখার' জন্য আর্থিক সুযোগ দিয়ে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করা নয় কি?

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যারা প্রকৃত গরীব আর্থিক সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই সবধরনের সাহায্য দেওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় ইমাম ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ খুশি হয়েছে। তাই, আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আগামী নির্বাচনে মুসলমানগণ সব ভোট—'তৃণমূল কংগ্রেস' কে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীও খুশি মুসলিম 'ভোট ব্যাঙ্ক' তৈরি করতে পেরে। আগামী নির্বাচনে 'ভোট বৈতরণী' অনায়াসেই পার হয়ে যাবেন। একেই বলে মুসলমান তোষণ, অধিক তোষণ একদিন বিষময় হয়ে ক্যানসার ব্যাধিতে পরিণত হবে, সেদিন কোনও ঔষধেই কাজ করবে না। কবে আমাদের রাজনৈতিক চৈতন্য হবে?

অনিল চন্দ্র দেবশর্মা, দেবীবাড়ী, নতুন পাড়া, কোচবিহার।

'সংবাদপত্রের' উপর নিষেধাজ্ঞা

পাঁচটি অক্ষরে কথা 'পরিবর্তন' যে কত সাংঘাতিক হতে পারে তার জ্বলন্ত নগ্নরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল সরকারি পাঠাগারে, সরকারের তোষামোদ, পদলেহন করতে না পারা ও শাসক (পড়তে হবে শোষক) শ্রেণীর মারাত্মক ভুলত্রুটি সংবাদপত্র পাঠকদের সংবাদের মাধ্যমে তুলে ধরার অপরাধ স্বরূপ শাস্তি বিধান, বিশেষ বিশেষ কতকগুলি সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষেধ পাঠাগারে।

স্বৈরতন্ত্রের ক্যাপ্টেন হিটলার যদি আজও বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি স্বৈরতন্ত্রের নারকীয়তায় একজন মহিলার পরে স্থান পেয়েছেন শুনলে মুকুলের ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতেন।

মমতার জানা আছে নিশ্চয়ই 'পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড' কথাকটি কত ভয়ঙ্কর। বিগত সরকারের যাবতীয় খুন, জখম, ধর্ষণ, স্বজন পোষণ, হত্যা, দুর্নীতি, তহবিল তছরূপ, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের মতো নারকীয় ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরার পরিপ্রেক্ষিতেই বিগত দুঃশাসনের পতন। মনে করেছিলাম রাবণের শাসন থেকে রামের শাসনাধীনে এলাম। কিন্তু দেখছি রামে মারলেও মারবে আর রাবণে মারলেও মারবে। জনগণ অসহায়।

যে সকল পত্রিকা পাঠাগারের শোভা বর্ধন করবে সেইসব তৈলমর্দনকারী ও তোষামোদকারী সংবাদপত্রগুলিরও জানা থাকা উচিত ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।

কেউ কেউ ২৫/২৬ বছর ধরে, আবার কেউ কেউ নবজন্মলগ্ন থেকে বিদায়ী সরকারের যাবতীয় কুকর্মের প্রতিবাদ করে পরিবর্তনের জন্য একটা সুষ্ঠু বাতাবরণ তৈরীতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু কিছু সাংসদ কিছু বিধায়ক পার্টির মুখপত্রের ন্যায় পত্রিকাগুলিকে সর্বাধিক প্রচারের ব্যর্থ চেষ্টায় প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাতে সরকারকে ইন্ধন জোগালো আর কানপাতলা মুখ্যমন্ত্রীও শিশুদের ন্যায় তাই করে বসলেন। আগুন যেমন ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায় না স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায্য সংবাদ পরিবেশন করা সংবাদপত্রগুলিকে 'মুজিবর রহমানের ভাষায় বলি, 'আমাকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না'। সময়ই সব জানাবে। হিটলার, মুসোলিনী, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির সাহের ন্যায় ওঁরও পতন অবশ্যম্ভাবী। আসলে সিংহাসন সকলের সহ্য হয় না।

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

পাগলের গো-বধে আনন্দ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বেশ কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের দিদির কার্যকলাপের দিকে নজর দিলে বেশ বুঝতে পারা যায় তার দিনকাল বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। একে তো ভাঁড়ে মা ভবানী, এরপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো পার্কস্ট্রিট কাণ্ড থেকে শুরু করে কলেজে কলেজে অধ্যক্ষ নিগ্রহ, একই অপরাধে দু'রকম পুলিশী ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক নিগ্রহ এবং তজ্জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সাবধানে হ্যান্ডেল না করে চটজলদি মন্তব্য করে ঘটনাকে আরও জটিল করে তোলা, মহাকরণে ডেকে এনে জয়েন্ট কমিশনার ক্রাইম দময়ন্তী সেন-কে অযথা কড়কে দেওয়া পর্যন্ত সকল ঘটনা বা দুর্ঘটনাগুলোকে যুগপৎ যদি একসঙ্গে সাজানো যায়, কারও বুঝতে বাকি থাকে না পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোরালো হয়ে একেবারে থমথমে হয়ে আছে। কোনও মন্ত্রী থেকে আমলা একেবারে স্পিকটি নট। শুধু তার কিছু বশংবদ চেলাচামুণ্ডা যাদেরকে তিনি একেবারে ফুটপাথ থেকে তুলে এনেছিলেন তারাই শুধু আবোল-তাবোল বকে চলেছেন প্রতিনিয়ত। অনেকটা বাবু যত বলে পারিষদ বলে তার শতগুণ এরকম একটা দুঃসহ অবস্থা। এই অপরিণত মস্তিষ্কের সর্বশেষ সংযোজন রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীর অপসারণ।

প্রশ্ন হলো— এটা কি মতিভ্রম, আবেগতাড়িত রাজনীতি, না মস্তিষ্কের সংকট? মতিভ্রম হলে তাতে আমি আশ্চর্য হব না কারণ মুনি-ঋষিদেরও মতিভ্রম হয়। এটাকে কাটিয়ে ওঠা যায়, আর আবেগতাড়িত রাজনীতি হলে একটু ভাবার ব্যাপার আছে। এই ধরনের রাজনীতি কখনও কখনও সুফল দিতে পারলেও সামগ্রিকভাবে এটা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। দেশের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। আর দ্বিতীয় কারণটি মস্তিষ্কজনিত। অনেকটাই জেনেটিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত। মানুষের ব্রেনটা অনেকটাই নেচার মেড। সুতরাং যেটা নেচার মেড সেটা তো অনেকটাই পূর্বনির্ধারিত ব্যাপার। আমার ব্রেন কতটুকু নিতে পারবে, তার ক্ষমতা কতখানি, কতখানি স্পেস তার খোলা আছে, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি, আনন্দ, হর্ষ, দুঃখ, আবেগ, বিস্ময় এবং আরও অনেক কিছুই কতটুকু সে নিতে পারে তার একটা বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাব- নিকেশ আছে। আমাদের নিজের থেকে কিছুটি করার নেই। বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ভি এস রসাটন বলেন— একজন চেতনাসম্পন্ন মানুষ যখন কোনও কাজ করে সে কিন্তু একজন আর্টিস্ট, তার সমস্ত কার্যকলাপই একটা কম্পোজিট স্কিম-এর মাধ্যমে হয়। তার কথা বলা, কথাশোনা, সেই অনুযায়ী রিঅ্যাক্ট করা বা না করা, কোনও কিছু লেখা, পড়া, ফাইলে নোট দেওয়া, কাউকে কোনও আদেশ দেওয়া, কোনও কাজ করতে বলা বা নিষেধ করা, কোনও সিদ্ধান্তে আসা বা কোনও ফার্ম ডিসিশন নেওয়া বা তা থেকে বিরত থাকা, তার চলন-বলন, হাবভাব এমনকী ব্যবহার ও তার সমগ্র কার্যাবলীর এক একটি কম্পোজিট আর্ট, সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কম্পোজিট স্কীম বা চরিত্র হয়ে যায়। ব্রেন সেটা একটা মানে তৈরি করে, আনকনসাসলি অনেক কাজ আমরা করে ফেলি সেটা অনেক সময় ভাল কাজও হয়ে যেতে পারে কিন্তু কনসাসলি করলে অর্থাৎ জেনে বুঝে করলে কাজটা আরও ভাল হয়।

বাস্তবিক আমরা জিন এ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট বহন করছি। নিড অ্যান্ড গ্রেড-এর অর্থাৎ প্রয়োজন ও লোভের পার্থক্যটা এতই সূক্ষ্ম যে আমরা বুঝতে পারছি না। আমাদের মধ্যে সব সময় একটা দ্বিচারিতা কাজ করে। আমরা যা বলি বা বলবো বলে মনে করি বাস্তবে করি ঠিক তার উল্টো, একটা constant hypocrisy আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। Life skill education-টা খুব দরকার। নিজেদের এনরিচ করতে করতে গেলে আমাদের আরও বেশি করে পড়তে হবে। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের আরও বেশি করে তা করতে হবে, কারণ তাদের হাতে দেশের শাসন ভার ন্যস্ত করা আছে, দায়িত্ব তাদের আরও বেশি।

এই মনস্তাত্ত্বিক কারণটি আমাকে বিশেষ করে ভাবাচ্ছে, তাহলে কি আমরা ভুল জায়গায় তরী বাঁধলাম? প্রশ্নটা স্বাভাবিক কারণেই উঠে আসছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আপনার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি স্তাবকতায় ভুলবেন না। আপনি স্থিতধী হোন। বাংলার মানুষের অনেক আশা আপনাকে ঘিরে। পাঁচ বছরে আপনি নিজেকে পাল্টান দেশ চালাতে, শুধু নিজে সৎ হলেই হবে না, সততা দেশের কল্যাণে খাটাতে জানতেও হবে। দল দেশের থেকেও বড় হতে পারে না। এভাবে কখনই গণতন্ত্র টেঁকে না। স্বৈরাচারী শাসনের ফল কী মারাত্মক হতে পারে তা আপনি জানেন। আপনি জেনে রাখুন দলের মধ্যে অনেকেই আপনাকে ব্যঙ্গ করে গোপনে আপনার নাম দিয়েছেন ''আজানো বন্দ্যোপাধ্যায়''। প্রবীণেরা বলছেন— পাগলের গো বধে আনন্দ। শতবার ভাবুন।

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

পৌরাণিক চরিত্র

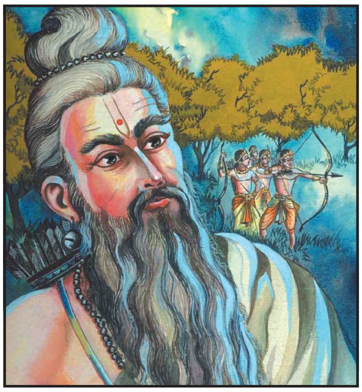

আচার্য দ্রোণ

প্রিয়াংশু বিকাশ ভট্টাচার্য

গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) ভরদ্বাজ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি সততই তপস্যা করতেন। তিনি একদিন মহর্ষিদের সঙ্গে হবিধানাতে গঙ্গাস্নান করতে যান। সেখানে অপ্সরা ঘৃতাচী স্নান করছিলেন। তিনি কামার্ত হয়ে পড়েন। তার স্খলন হলো—

ভরদ্বাজস্য চ স্কন্নং দ্রোণাং শুকমবধত।
মহর্ষেরুগ্রতপসস্তস্মাদ দ্রোণ ব্যজয়তি।।

দ্রোণী অর্থাৎ পর্বতগুহাতে স্খলিত মহর্ষি ভরদ্বাজের বীর্য হতে দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্র বেদ বেদাঙ্গে পারদর্শী হয়। অগ্নি হতে জাত অগ্নিবেশ নিজ গুরু জাত পুত্রকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করেন। রাজা পৃষৎ ভরদ্বাজ ঋষির সখা ছিলেন। তার পুত্র দ্রুপদ ভরদ্বাজের আশ্রমে এসে দ্রোণের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন। পৃষাতের মৃত্যু হলে দ্রুপদ পাঞ্চাল দেশের রাজা হন। সেখানে ভরদ্বাজের মৃত্যু হলে দ্রোণ সেখানে তপস্যা করতে থাকেন। বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী মহর্ষি দ্রোণ শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন। গৌতম বংশজাতা কৃপী অশ্বত্থামা নামক একটি পুত্রের জননী হন। অশ্বের মতো ডাক দিয়েছিল বলে তার নাম অশ্বত্থামা রাখা হয়। দ্রোণ শুনতে পেলেন পরশুরাম ব্রাহ্মণদের সর্বস্ব দান করছেন। তিনি দিব্যাস্ত্র সমূহ ধনুর্বেদ ও নীতি শিক্ষা করেন পরশুরামের নিকট হতে। কারণ পরশুরাম তখন সর্বস্ব দান করেছিলেন ব্রাহ্মণদের। কশ্যপমুনিকে পৃথিবী দান করেন। দ্রোণ প্রার্থনা করেছিলেন—

অহং ধনমনন্তং হি প্রার্থয়ে বিপুলব্রত।।

আমি আপনার নিকট অনন্ত ধন প্রার্থনা করি। এই সমস্ত ধনুর্বিদ্যা নিয়ে বাল্যবন্ধু দ্রুপদের নিকট গেলেন। দ্রুপদ দ্রোণকে উপহাস করলে, মহাক্রুদ্ধ হলেন এবং ফিরে এলেন কৃপাচার্যের গৃহে। ভীষ্ম বুঝতে পেরে তাকে আচার্য পদে বৃত করলেন। ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে বাসগৃহ প্রদান করলেন, বহু ধনরত্ন দান করলেন। কুমারদের অস্ত্রশিক্ষার দায়িত্বভার তার হাতে সমর্পণ করলেন। সুতপুত্র কর্ণও তার শিষ্য হলেন। দ্রোণ তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা বললেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

এরপর নিষাদরাজা হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য অস্ত্রশিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে এলেন। শিষ্য অর্জুনের কথা ভেবে দ্রোণ তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। রঙ্গভূমিতে একটা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করা হলো। সেখানে গান্ধারী কুন্তী অন্যান্য রাজমহিষীগণ বস্ত্রালংকারে বিভূষিতা হয়ে দাসদাসীদের সহিত উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রজাগণ সেখানে সমবেত হলেন। কুমারগণ রক্তচন্দনমিশ্রিত পুষ্পাদি দ্বারা অস্ত্রগণের পূজা সমাপন করলেন। রঙ্গভূমিতে অর্জুন বহু বিচিত্র রণকৌশল দেখালেন। সেই সময় কর্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। তিনি সমস্ত রণকৌশল প্রদর্শন করতে পারবেন বললেন—

সৎ কৃতং তত্র পার্শেন তচ্চকার মহাবলম।।

অর্জুন প্রদর্শিত সমস্ত ক্রীড়াকৌশলই কর্ণ প্রদর্শন করলেন। এবার কর্ণ অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু কৃপাচার্য অর্জুনের পরিচয় দিয়ে কর্ণের পরিচয় জানতে চাইলেন। কর্ণ হীনকুলে জন্ম বলে আচার্য কৃপ যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করলেন। আমি তোমার সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্ব কামনা করি। দুর্যোধন কর্ণের সাহায্য নিয়ে দ্রুপদকে জয় করতে গেলেন, পারলেন না। অর্জুন তাকে পরাজিত করে বন্দী করে নিয়ে এলেন।

পৃষৎ নন্দন দ্রুপদকে বন্দী করে নিয়ে আসার পর দ্রোণ তাকে কোনও শাস্তি দিলেন না। দ্রোণ ভাগীরথীর উত্তর তীরবর্তী অহিচ্ছত্র নামে পাঞ্চাল দেশকে নিজ অধিকার নিয়ে এলেন—

দ্রুপদ এই অপমান ভুলতে পারলেন না। তিনি পুত্র কামনায় যজ্ঞ করলেন। সেখান থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব হলো। এই ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণাচার্যকে নিরস্ত্র হলে তাকে হত্যা করলেন। ত্রয়োদশ দিবসে দ্রোণ বিরাট ও দ্রুপদকে হত্যা করেন। দ্রোণাচার্যের ভয়ংকর মূর্তি দেখে অগ্নিদেবকে সামনে রেখে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ইত্যাদি মুনিগণ তাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাবার জন্যে উপস্থিত হলেন। আরও ঋষিরা সেখানে এলেন। দ্রোণকে অস্ত্র পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। তোমার পক্ষে ক্রুর কাজ শোভা পায় না। হত্যা একটা ক্রুর কাজ।

দ্রোণ একাদশ দিবসে কৌরব সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত হলেন। দ্রোণাচার্যের হাতে ধনুর্বাণ থাকলে দেবরাজ ইন্দ্রও তাকে পরাজিত করতে পারবে না।

অশ্বত্থামা হত হয়েছে শুনতে পেয়ে দ্রোণাচার্য দুঃখিত হলেন। অস্ত্র পরিত্যাগ করে রথে যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন। রথে আরোহন করে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে দ্বিখণ্ডিত করলেন।

দ্রোণ তখন অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক রথে যোগাসনে উপবিষ্ট হলেন। সূর্যসদৃশ্য তেজস্বী দ্রোণাচার্যরূপী দিবাকর উদিত হলো আকাশে। নিমেষের মাঝে সেই জ্যোতি আকাশে অদৃশ্য হলো।

সঞ্জয়, অর্জুন, কৃপাচার্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির এই জ্যোতি দেখতে পেলেন। দ্রোণাচার্যের অন্তরস্থ আত্মা ব্রহ্মলোকে বিলীন হলো।

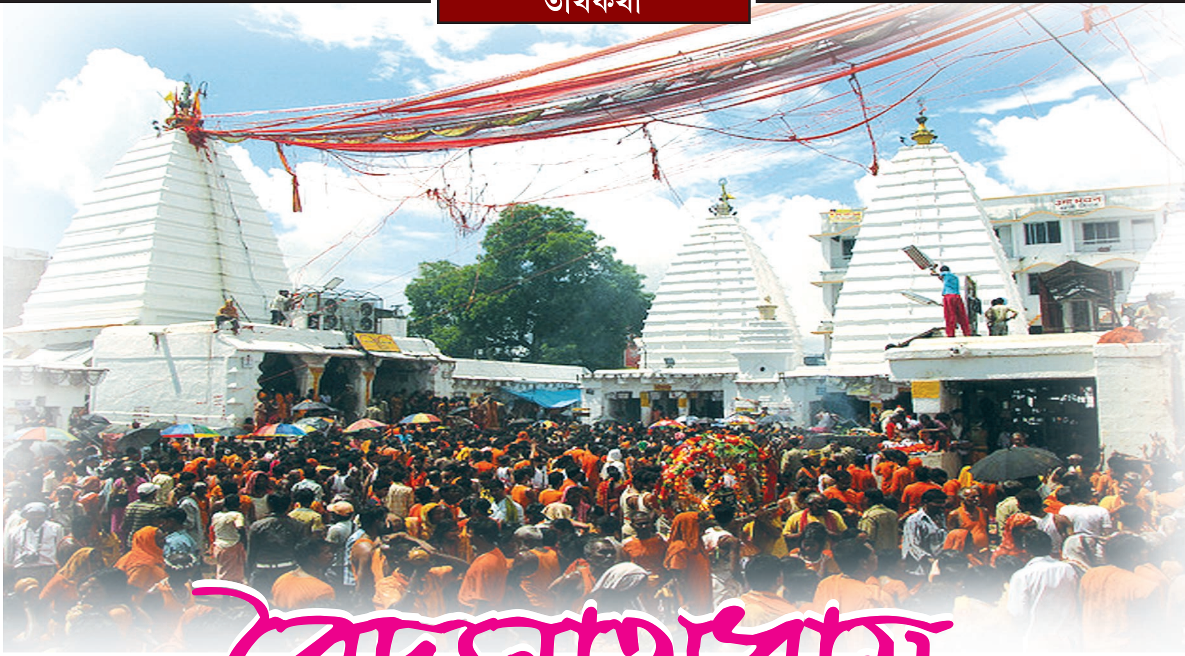

বৈদ্যনাথধাম

নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষসরাজ রাবণের ইচ্ছা তিনি কৈলাস থেকে শিববাবাকে মাথায় করে নিয়ে যাবেন লঙ্কায়। সেখানেই প্রতিষ্ঠা করবেন মহাদেবকে। কিন্তু মহাদেব কৈলাস ছেড়ে লঙ্কায় যেতে নারাজ। উপায় বার করতে বসলেন দেবতারা। বিষ্ণু বার করলেন উপায়। বরুণদেবের ছলনায় পথে হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ পেল রাবণের। এদিকে কথা রয়েছে হাত থেকে মহাদেবকে নামানো চলবে না। এদিকে বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে পথে দাঁড়িয়েছিলেন। রাবণ মহারাজ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে বললেন, এই শিবলিঙ্গটিকে একটু ধরুন আমার প্রস্রাবের বেগ পেয়েছে। নারায়ণবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন— দেখ বাপু, আমি কিন্তু এই লিঙ্গ হাতে নিয়ে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না। রাবণ বললেন, আমি এখুনিই আসছি। কিন্তু বরুণদেবের ছলনায় সেই প্রাকৃতিক ক্রিয়া চলল দশ মাস ধরে। রাবণ ফিরে এসে দেখলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিবলিঙ্গটিকে মাটিতে নামিয়ে রেখেছেন এবং মূর্তিটিও স্থির হয়ে বসে গেছেন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে সরাতে না পেরে ক্রোধে দেবের মাথায় এক চাঁটি মারলেন। আজও শিবলিঙ্গের শিরে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ অনুভব হয়। স্থানের নাম অনুসারে শিবলিঙ্গের নাম বৈদ্যনাথ শিব। কেউ কেউ রাবণেশ্বর শিবও বলেন। এককালে বৈদ্যনাথ ধাম পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পরে বিহার এবং বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। শ্রাবণ মাস বাদেও সারা বছর ধরে এখানে ভক্তের সমাবেশ থাকে। বাবা বৈদ্যনাথের কাছে রোগমুক্তির জন্য মানত করলে বিফল হবার উপায় নেই। বৈদ্যনাথ মন্দিরে বাবা ছাড়াও পার্বতী মন্দির রয়েছে। মন্দির চত্বরই হলো এখানকার প্রধান আকর্ষণ। মন্দিরে পাণ্ডা থাকলেও এখনও নিজেই শিবের পুজো করতে পারেন।

কীভাবে যাবেন :

দেওঘর বা বৈদ্যনাথধাম যেতে গেলে নামতে হবে জোশিডি স্টেশনে। হাওড়া থেকে জোশিডি যাচ্ছে— ১২৩০৩ হাওড়া নিউ দিল্লী পূর্বা এক্সপ্রেস (ছাড়ছে সকাল ৮-১০ মিনিটে, পৌঁছবে সকাল ১২-২৫ মিনিটে) ৩০০৭ হাওড়া উদ্যান আভা তুফান এক্সপ্রেস (ছাড়ছে সকাল ৯-৪৫ এবং পৌঁছবে বিকেল ৪-৩০ মিনিটে)। ১২০২৩ হাওড়া পাটনা জনশতাব্দী (ছাড়ছে দুপুর ২-৫ মিনিটে, পৌঁছবে বিকেল ৪-৩০ মিনিটে)। কলকাতা হাওড়া গরিব রথ, কলকাতা দিল্লী লালকেল্লা এক্সপ্রেস, বিভূতি এক্সপ্রেস ইত্যাদি। সাধারণ ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ১৫৪ টাকা। এছাড়া লোকাল ট্রেনে বর্ধমান-আসানসোল থেকে জোশিডি যেতে পারেন। আসানসোল থেকে সকাল ৯-২০-তে ছাড়ে ঝাঁঝাঁ লোকাল, তারপরের লোকাল বিকেল ৬-৩০ মিনিটে। তবে হাওড়া আসতে সকাল ৬-৩০ মিনিটে বৈদ্যনাথ ধাম স্টেশন থেকে আসানসোল লোকাল রয়েছে। আসানসোল থেকে বর্ধমান প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন রয়েছে। লোকাল ট্রেনে হাওড়া বৈদ্যনাথধাম বা জোশিডি ভাড়া মাত্র ৫৪ টাকা। জোশিডি স্টেশন থেকে বৈদ্যনাথধাম অটো জন প্রতি ভাড়া এই মুহূর্তে ৮ টাকা।

কোথায় থাকবেন :

বৈদ্যনাথধামে থাকার জন্য নানা ধরনের হোটেল ও ধর্মশালা রয়েছে। মন্দিরের কাছাকাছি অন্নপূর্ণা ভবন, মাড়োয়ারি ধর্মশালা, মা কামাক্ষ্যাধাম আশ্রম। রয়েছে জে টি ডি সি-র হোটেল হোটেল নটরাজ বিহার। হোটেল বৈদ্যনাথ বিহার, হোটেল সাগর। ভাড়া ১০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। এছাড়াও কয়েকশ হোটেল ও ধর্মশালা রয়েছে। শ্রাবণমাস ছাড়া এখানে লোকসংখ্যা কমই থাকে।

কী দেখবেন :

বৈদ্যনাথ মন্দির। দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গের অন্যতম হলো এখানকার শিবলিঙ্গ। অন্যতম পীঠও। দেবীর পায়ের আঙুল পড়েছিল এই স্থানে। রয়েছে পার্বতী মন্দির, নীলকণ্ঠ শিব, বগলামুখী, মা কালী, অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য ছোটবড় আরও কয়েকটি মন্দির। মন্দিরের উচ্চতা ৭২ ফিট। পাশে রয়েছে শিবগঙ্গা বা হৃদয়কুণ্ড।

দেখার রয়েছে :

নওলখা মন্দির, মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম, তপোবন পাহাড়, নন্দন পাহাড়, হরিলাজুড়ি, কুণ্ডেশ্বরী মন্দির, নবদুর্গা মন্দির প্রভৃতি। এগুলি ঘোরার জন্য অটো বা টাঙা রয়েছে। একটু দূরে রয়েছে ত্রিকূট পাহাড় এবং বাসুকিনাথ শিবের মন্দির। যাওয়ার জন্য অটো বা গাড়িভাড়া পাওয়া যাবে। বৈদ্যনাথ ধামে রয়েছে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম। এছাড়া বেড়ানোর জায়গা রয়েছে জোশিডির পরে শিমুলতলা এবং পূর্বে মধুপুর। মধুপুর থেকে যাওয়া যায় গিরিডি।

শোভাবাজার রাজবাড়ি-ছোট তরফ

কুলদেবতা গোপীনাথ জিউ

অর্ণব নাগ

রাজা নবকৃষ্ণ দেবকে একুশ শতকের বাঙালি কেন মনে রাখবে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহাবিতর্কিত প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, তিনি যে কলকাতার প্রথম রাজা (উপাধিপ্রাপ্ত) এনিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। প্রথমত, বাঙালির নস্ট্যালজিয়া বলে একটা বদভ্যাস রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় সওয়া তিনশো বছরের প্রাচীন কলকাতা শহরের বাবুবিলাস একটি অন্যতম উপাদান। আর এক্ষেত্রে রাজা নবকৃষ্ণের নাম সর্বাগ্রে আসা উচিৎ। দ্বিতীয়ত, আঠেরো-উনিশ শতক চর্চায় ইদানীং খুব আগ্রহ বেড়েছে। সেদিক দিয়ে ওই সময়ের বাংলায় আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, এমনকী ক্রীড়াক্ষেত্রেও রাজা নবকৃষ্ণদেব এবং পরবর্তীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শোভাবাজার রাজবাড়ির অবদান অনস্বীকার্য। তৃতীয়ত, রাজা নবকৃষ্ণ অন্তত দু'টি ব্যাপারে— এক, নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মৃৎশিল্পীদের কুমোরটুলীতে এনে বসানো ও দুই, উৎকলবাসীদের ঘর-গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত করার জন্য ওড়িষা থেকে কলকাতায় আনানোর ক্ষেত্রে যে কর্মতৎপরতা দেখিয়েছেন ইতিহাসের পাতায় তা নিঃসন্দেহে অমরত্বের স্বীকৃতি পাবে। আর এই তৃতীয় বিন্দুটিই যে রাজা নবকৃষ্ণকে আধুনিক প্রজন্মের মনে রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোরালো একটি কারণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাতবার বিয়ে করার পরেও রাজা নবকৃষ্ণের কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহনকে দত্তক নেন। পরে ৪৯ বছর বয়সে নিজের পুত্র সন্তান রাজকৃষ্ণ জন্মালে তাঁকে নিয়ে আদি বাড়ির দক্ষিণে আরেকটি প্রাসাদ নির্মাণ করে সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন।

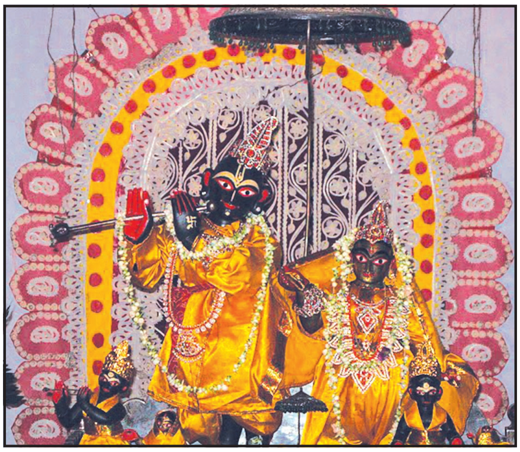

গোপীনাথ-রাধারাণী যুগল মূর্তি।

গোপীমোহন দেবের পুত্র স্বনামধন্য স্যার রাধাকান্ত দেব, আটখণ্ডে বিভক্ত সংস্কৃত শব্দকোষ 'শব্দকল্পদ্রুমে'র রচনা যাঁকে অমরত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে, তাঁর বংশধরেরা পরবর্তীকালে শোভাবাজার রাজবাড়ির বড় তরফ (বর্তমান ঠিকানা ৩৩ আর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের সিংহদরজাওয়ালা বাড়ি)। এবং নবকৃষ্ণের স্বীয়পুত্র রাজকৃষ্ণের বংশধররা (তাঁর ৮ পুত্র) শোভাবাজার রাজবাড়ির ছোট তরফ (বর্তমান ঠিকানা ৩৬ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট) হিসেবে সাধারণ্যে পরিচিত হয়েছেন।

রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর গোপীমোহন-রাজকৃষ্ণের সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারায় মামলা গড়ায় প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত। সেই মামলার পর আপোষ মীমাংসায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রাজকৃষ্ণ তাঁর ভাগে গোপীনাথকে চেয়ে নেন। সেই থেকে ছোট তরফের কুলদেবতা গোপীনাথ জীউ। শোভাবাজার রাজবাড়িতে এঁর প্রতিষ্ঠার আড়াইশো বছর পূর্তি এবার ধূম-ধাম করে পালিত হচ্ছে। এই গোপীনাথ জিউ-এর একটি ইতিহাস রয়েছে। ইনি আদতে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির কুলবিগ্রহ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অবস্থার গতিকে নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হলে গোপীনাথ জীউকে রাজা নবকৃষ্ণের কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হন। পরে অবস্থা ফিরলে প্রয়োজনীয় ঋণ শোধ করে প্রতিশ্রুতিমতো তাঁর বন্ধকী কুলবিগ্রহকে নিয়ে যাবার বার্তা পাঠান নবকৃষ্ণের কাছে। প্রমাদ গুণলেন কলকাতার রাজা। কারণ ততদিনে গোপীনাথের ওপর আলাদা টান জন্মেছে তাঁর। নবকৃষ্ণ তলব করলেন কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের। এঁদের দিয়ে অবিকল মূর্তি তৈরি করালেন গোপীনাথের। আসল-নকলে প্রভেদ করা ভার। শুধু বোঝার জন্য আসল গোপীনাথের পায়ের তলায় পদ্ম এঁকে রাখা হলো। শেষপর্যন্ত সেই মহাভুলটাই করলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজ। তিনি বন্ধকী ধার মিটিয়ে ছাড়ালেন নকল গোপীনাথকে। আসল গোপীনাথ চিরকালের জন্য কুলদেবতা হিসেবে রয়ে গেলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির ছোট তরফে।

গোঁড়া হিন্দু রাজা রাজকৃষ্ণ যৌবনে কিন্তু মুসলমানদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে তাঁর মতি ফেরান সম্ভবত কুলদেবতা গোপীনাথ-ই। সেই বাজারে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার ঐশ্বর্য (আজকের দিনে তার মূল্য নির্ধারণ একপ্রকার অসাধ্য) গোপীনাথের নামে উইল করে দিয়ে যান তিনি। কুলদেবতা গোপীনাথের সঙ্গে শোভাবাজার রাজবাড়ির ছোট তরফের নাড়ির বন্ধন। বিজয়ার দিন প্রণাম আর মিষ্টিমুখের আগে গোপীনাথের ঘরে যেতে হয় প্রত্যেককে। কুলদেবতাকে প্রণামের পর পূজারী প্রত্যেকের মাথায় নতুন কাপড়ের সরু লম্বা টুকরো বেঁধে দেন। এই চিহ্ন-ই কাজ করে গোপীনাথ জীউয়ের ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে। বিজয়ার দিন গোপীনাথকে প্রণাম করার আগে অন্য কাউকে প্রণাম করা বা অন্যের প্রণাম নেওয়া রাজবাড়ির রীতিবিরুদ্ধ। এমনকী মহাধূমধাম করে দুর্গাপুজো করার পর কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিন মাটির প্রতিমা না এনে গোপীনাথ-রাধারাণী যুগল মূর্তি থেকে রাধারাণী দেবীকে লক্ষ্মী হিসেবে পুজো করার রেওয়াজ সেই সুদূর অতীত থেকে বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

কৃতজ্ঞতা : অলক কৃষ্ণ দেব

নবাঙ্কুর

বড়োদের পরামর্শ

‘ছোটোদের ছড়া পড়ার অভ্যেস দরকার’

বললেন ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

যখন ছোটো ছিলেন ছোটোদের জন্যে ভাবা তখন থেকেই শুরু। বই পড়ার অভ্যেস ছিল। ছোটোদের জন্যে লেখা বই পড়তেন। মজা পেতেন শব্দের পিঠে শব্দ জুড়ে বাক্য তৈরির খেলা দেখে। আবার মাত্রা মিল ছন্দ যোগ হলে বাক্য অন্যরকম হয়ে ওঠে। ছড়া গড়ার মজা পেয়ে গেলেন শব্দ নিয়ে খেলতে খেলতে। একই বাক্য কতভাবে সাজানো যায়— বুঝতে পারলেন। শব্দ ভাণ্ডারে জমতে লাগল নতুন নতুন শব্দ। শুধু শব্দ জমালেই তো ছড়াকার হওয়া যায় না। সেইসব শব্দ ঠিক ঠিক জায়গায় প্রয়োগ চাই। ছড়া লেখা হলেই ছাপা হবে— এমন ধারণা কারও কারও থাকে। কেউ ভাবেন ছড়া লেখা অতি সহজ কাজ। কেউ ভাবেন খুব কঠিন। সহজ-কঠিন যাই-ই হোক, ছড়া নিয়ে পঞ্চাশ বছর মেতে আছেন ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। ছড়ার বই বেরিয়েছে সত্তরটার বেশি। এখন চল্লিশটা পাওয়া যায়। অনেকগুলো বইয়ের একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রাম থেকে শহর তিনি মাতিয়েছেন ছড়ার যাদুতে। ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সঙ্গে একসময় যুক্ত ছিলেন। একটা ছবি অনেকেই দেখেছি, সুকুমার রায়ের জন্মশতবর্ষে ‘সন্দেশ’ পত্রিকার পক্ষ থেকে সেরা ছড়াকার সম্মান জানিয়ে তাঁকে পদক পরিয়ে দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায়। শিশুকিশোর একাডেমিও তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। সম্মান পেয়েছেন অনেক। তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় সম্মান ছোটোদের ভালোবাসা পাওয়া। ছোটোদের আপনজন হতে পেরেছেন। তাদের ঘিরেই তাঁর স্বপ্ন দেখা, শব্দ সাজানোর খেলা। হাওড়ার একটি জুনিয়ার হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক। স্কুল আর ছেলেমেয়েদের জন্যে ভেবেছেন, কাজ করেছেন। বিভিন্ন ছোটোদের পত্রিকার দাবি মিটিয়ে লিখেছেন। কয়েকটি পত্রিকায় ছোটোদের বিভাগ সম্পাদনা করেছেন। এখনও সেসব কাজে যুক্ত। ছোটোদের সঙ্গ পছন্দ করেন সবসময়। ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ যেখানেই যান সেখানে ছোটোবড়ো সকলের মন জয় করে নেন সহজে। ছড়া লেখা আর ছড়া পড়া নিয়ে তিনি বললেন :

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

‘ছোটোদের কবিতা পড়তে উৎসাহ দেওয়া দরকার সবসময়। কথা বলতে শেখার আগে ছন্দ তালের দুলুনিতে সাড়া দেয় তারা। তাদের ঠিকমতো উচ্চারণে ছন্দ মিল মাত্রা মনে রেখে ছড়া শোনালে তা মনে গেঁথে যায়। বড়ো হয়ে ছড়ার মাত্রা পর্ব বুঝতে পারে। শব্দভাণ্ডার গড়ে ওঠে। শব্দের উচ্চারণে ঝাঁকুনি থাকে। একটু বুঝে ছড়া শুনলে বা পড়লে তার অর্থ নিজের কাছে কিংবা অন্যের কাছে ছবির মতো স্পষ্ট রূপ নেয়। ছড়া লেখা একদিকে সহজ কাজ, অন্যদিকে কঠিন। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে দিলেই তো হবে না। ছড়া একটা নাড়া দেবে। একেবারে মাথামুণ্ডুহীন বিষয় হতে পারে, আবার অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয়। কি বলা হচ্ছে তার থেকে বড়ো হলো কীভাবে বলা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় ছড়াগড়ার কর্মশালায় গিয়ে দেখেছি, ছোটোরা খুব বুদ্ধির সঙ্গে শব্দ সাজাচ্ছে। তাদের নিজেদের জগৎ আছে, সেখানে অনেক জিনিস একেকভাবে আসে। আমরা বড়োরা সবসময় বুঝতে পারি না ছোটোরা কি চাইছে। আমি যখন দেখি ছোটোরা আমার লেখা ছড়া পড়ে মজা পাচ্ছে তখন বুঝি ওইটাই বড়ো পুরস্কার। ছোটোদের বলবো, নানারকম বই পড়ো। কবিতার আর ছড়ার বই পড়ো। বাংলা ভাষায় অনেক ছড়া লেখা হয়েছে। ছোটোবেলায় পড়া ছড়া বড়োরাও ভোলেন না। তোমাদের ছড়া পড়তে হবে। লিখতে হবে। দারুণ ছড়া লিখে বড়োদের মাতিয়ে দিতে হবে।’

সাক্ষাৎকার : কৌশিক গুহ

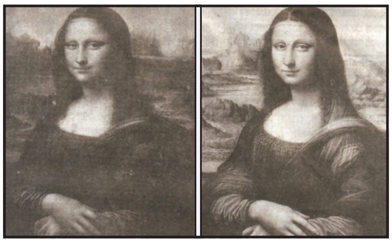

মূল মোনালিসা, ‘মোনালিসা’ অনুকরণে আঁকা

অন্য বার্তা

মোনালিসার সবচেয়ে পুরনো কপি পাওয়া গেল

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত ছবি মোনালিসা-র প্রিন্ট আমরা প্রায় সকলেই দেখেছি। সাদা কালো কিংবা রঙিন ছাপা ছবি দেখে আমরা মোটামুটি ধারণা গড়ে নিই। বিখ্যাত ছবির নকলও আঁকা হয়েছে কম নয়। অনুকরণ আর অনুসরণ ব্যাপারটা থাকে। মূল ছবি দেখার সাধ্য না থাক সেই সাধ মিটেছে বেশিরভাগ মানুষের আসল ছবির কপি দেখে। তবে সবদেশে সবসময়ে নকল ছবি আঁকিয়েদের ভালো বাজারদর থাকে। কারিগরি দক্ষতায় হুবহু নকল করা গেলেও মূল ছবির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে সেই রচনা পদ্ধতি আয়ত্ত সম্ভব হয় না।

স্পেনের মাদ্রিদের প্রাদো মিউজিয়ামে ‘মোনালিসা’র একটি নকল পাওয়া গেছে। বলা হয়েছে, এটা সবচেয়ে পুরনো নকল। স্পেনের ওই সংগ্রহশালার ছবি সংরক্ষণের কাজ চলাকালে ওই ছবিটির সন্ধান মেলে। চিত্রকলা-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ছবিটি যাঁর আঁকা তাঁর সঙ্গে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ভালোমতোন যোগাযোগ ছিল। ছবিটি মোনালিসা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আঁকা হলেও দ্য ভিঞ্চি তাতে হাত দেননি। শিল্পীর আঁকা। কিন্তু নাম কি তাঁর? সেও এক রহস্য থেকে গেল। তবে ছবিটি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সবরকম ব্যবস্থা হয়েছে।

—বার্তাবহ

রিয়াদের রবীন্দ্রজয়ন্তী

বাড়িতে ঠিক হলো রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে একটা অনুষ্ঠান হবে। রিয়াদের বাড়ির দোতলার ছাদটা বেশ বড়ো। ছাদের পাশে একটা বেল গাছ। তার ডাল ছাদে এসে পড়েছে। অনেকেই বেলপাতা নিয়ে যায়। বাগানের বড়ো বড়ো গাছ থেকে গরমের দিন বিকেলে চমৎকার হাওয়া আসে। ছাদে একটা আলো জ্বলে। ঠিক হলো একটা জোরালো আলো লাগানো হবে। বিকেলের আগেই তা লাগিয়ে দিল হীরককাকু। বাড়িটা বড়ো। বাড়িতে অনেকগুলো পরিবার। অনেক বছর ধরে বসবাস। একটু আধটু ঝগড়াঝাঁটি মাঝেমধ্যে হলেও পরস্পরের মধ্যে খুব মিল। একজনের বিপদ আপদে পাশে থাকে অন্যরা। বাড়ির ছোটোদের খুব উৎসাহ। গান নাচ আবৃত্তি হবে। গিটার বাজাবে একজন। একটা নাটকের একটু অংশ পড়া হবে। ছোটোরা বলেছে, 'যোগ দিতে হবে সকলকে। প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু করতে হবে।' শংকর-জেঠু বলল, 'আমি কিছু করতে পারবো না সকলকে রসগোল্লা খাওয়াবো।' স্বপনকাকু বলল, 'আমি সিঙাড়া আনবো।' এইভাবে খাওয়ার দায়িত্ব একেকজন নিল। রিয়ার মা বলল, 'আমি সকলের জন্য চা করবো।' বিজু পিসি বলল, 'আমি ছোটোদের একটা করে চকোলেট দেবো।' রিয়ার বাবা বলল, 'আমি অনুষ্ঠান শেষে একটা জিনিস দেবো।' পৃথ্বীশ-জেঠু একটা ছবি এঁকে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। সেটা সাজানো হলো। ফুলমালা এসব এনে রাখা ছিল আগেই। দুটো বোর্ডে লাগানো হলো রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের ছবি। ছবিগুলো দিয়েছে মঞ্জুমাসি। শুধু বলেছে, 'একটাও হারাবে না কিন্তু।' শান্তাদিদি তাদের ঘর থেকে নিয়ে এলো রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বই। তা সাজানো হলো একটা টেবিলে। রিয়ার দাদু বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ। তিনি হলেন সভাপতি। অনুষ্ঠান শুরু হলো ছ'টায়। বাড়ির ছাদে বাড়ির লোকজনকে নিয়ে অনুষ্ঠান। বাইরের কেউ কেউ এলো। রাত ন'টায় অনুষ্ঠান শেষ হলো। সকলেই আনন্দ পেয়েছে। রিয়া রবীন্দ্রনাথের ছবির সামনে গিয়ে বলল, 'তোমার জন্মদিনে আমাদের প্রণাম রইল।' রিয়ার মা বলল, 'তোমাকে আমরা রোজ প্রণাম করবো।' রিয়ার বাবা একটা বাদামি রঙের প্যাকেট প্রত্যেকের হাতে দেওয়ার জন্যে রিয়া আর টুবলাইকে দিলো। তাতে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইটা, আর রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি। যেটা তুলেছিলেন সুকুমার রায়।

—**বইমিত্র**

প্রশ্নবাণ

১. রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের একজনের নাম ছিল পঞ্চানন। পদবী কি?
২. দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম কোন্ সালে?
৩. দেবেন্দ্রনাথকে কি বলা হোত?
৪. রবীন্দ্রনাথকে জমিদারি দেখতে কোন সালে, কোথায় পাঠানো হয়েছিল?
৫. রবীন্দ্রনাথকে প্রথম 'গুরুদেব' বলেছিলেন কে?
৬. ১৯৪০ সালের ৭ আগস্ট রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি.লিট উপাধি দেয়। মানপত্র লেখা হয়েছিল কোন ভাষায়? রবীন্দ্রনাথ কোন ভাষায় উত্তর দেন?

উত্তর : ১. কুশারী। ২. ১৭৯৪। ৩. মহর্ষি। ৪. ১৮৯১। শিলাইদহ। ৫. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ৬. ল্যাটিন ভাষায়। সংস্কৃত ভাষায়।

ছোটোদের বলছি

ছোটোদের কথা সবসময় ভাবে 'স্বস্তিকা।' সেই ভাবনা থেকে তৈরি হয়েছিল ছোটোদের বিভাগ 'নবাঙ্কুর'। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর নতুনভাবে বিভাগটি শুরু হয়েছে। ছোটোরা জানাও কেমন লাগছে। নিজেদের লেখা, আঁকা পাঠাও।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা।

উলটো পালটা

স্কুলে সবসময় চটপট উত্তর দেয় সুমিত। যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে তৈরি। সেদিন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা বললেন—'আগের দিন তোমাদের শিখিয়েছিলাম জলের রাসায়নিক পরিচয়। কার কার মনে আছে বলো?'

সুমিত সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল। দিদিমণি বললেন, 'বলো।'

সুমিত চটপট বলল, HIJKLMNO...

দিদিমণি অবাক। বললেন, 'কোথা থেকে জানলে?'

সুমিতের উত্তর তখুনি, 'আগের দিন ম্যাডাম আপনিই তো বললেন জলের রাসায়নিক সংজ্ঞা এইচ-টু-ও। আপনি প্রথম দুটো অক্ষর বলেছিলেন। আমি সবটা বলে দিলাম।'

।। ২।।

অনবরত মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস থাকে অনেক ছাত্রের। নতুন স্কুলে যোগ দিয়ে

সেটা লক্ষ্য করলেন হেডমাস্টারমশাই। তিনি অনেক ভেবেচিন্তে একটা কথা লিখে টাঙিয়ে দিলেন নোটিশ বোর্ডে। ছাত্ররা টিফিনের সময় দেখল :

'খোসমেজাজে বোঝাই করো
মিথ্যে কথার ঝুলি—
স্মৃতিশক্তি জোরালো চাই,
নয়তো মুখোশ যাবে খুলি।'

—রামগরুড় সংকলিত

যাত্রাশিল্পের এক প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী কাকলি চৌধুরী

ইন্দিরা রায়

অবিভক্ত বাংলায় পুরনো আমলে 'যাত্রা'-ই বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। এই শিল্পমাধ্যমটি যুগবিপর্যয়ের অনেক কন্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে লোকসংস্কৃতির ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য রক্ষা করে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। স্বতন্ত্রধারার অভিনয়কলার ধারক ও বাহক হিসেবে যাত্রা একটি প্রমোদমাধ্যম। যাত্রা শুধু আজ সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, অভিজাত আমজনতার কাছেও যাত্রাশিল্প সমাদৃত। এই অনন্য মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যাত্রাজগতে আজও শুধু অভিনয়ে নয়; জুটি

হিসেবে জনপ্রিয় অনল-কাকলির প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী কাকলি চৌধুরী আজ তাঁর নিজস্বতা ও অভিনয় কৌশলে যাত্রাজগতে খ্যাতির শীর্ষে। যাত্রাশিল্পের রীতি হলো দল বদল। একই দলে বেশিদিন কোনও শিল্পীই থাকেন না। অপেরার দলবদলে কখনও অপেরার নাম দেখে দর্শক যাত্রা দেখেন; আবার যাত্রার জুটি দেখে দর্শক সমাগম হয়। কাকলি চৌধুরী সেভাবেই অনলের সঙ্গে জুটি বেঁধে আজ দর্শকের মনে স্থান করে নিয়েছেন। কীভাবে এ সাফল্য আপনার জীবনে সম্ভব হলো জানতে চাইলে তাঁর সপ্রতিভ জবাব : আমার যাত্রায় আসা অভিনয়কে ভালবেসে নয়। মা ছিলেন যাত্রাভিনেত্রী কাজল চৌধুরী। অভাবের তাড়নায় ছোট্ট যখন, মা আমায় যাত্রায় শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় করান। কিন্তু অভিনয়ের প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না। আর পাঁচজন মেয়ের মতো সংসার করার স্বপ্ন ছিল। তবে আমার সাফল্যের পেছনে মার প্রেরণা তো ছিলই; তবে আমি নিজেই আয়ত্ত করেছি। এভাবেই অভিনয়ের প্রতি ভালবাসা জন্মায়। আর সাফল্যের পেছনে অবশ্যই পালাকার ভৈরব গাঙ্গুলি ও যাত্রাভিনেতা ও পালাকার অনল চক্রবর্তীর নাম স্বীকার্য।

কাকলি চৌধুরীর পেশাদারি হিসেবে যাত্রাজগতে প্রবেশ জগৎময়ী অপেরাতে যুক্ত হয়ে আটের দশকে। মাঝে কিছুটা বন্ধ ছিল। ৮৭, ৮৮ সাল নাগাদ লোকবন্দনা অপেরা, অপ্সরা অপেরা, '৯০-তে ভৈরব অপেরায় যোগদান। এখানে সাতবছর যুক্ত ছিলেন। এই অপেরা থেকেই সম্ভাবনাময়ী অভিনেত্রী হয়ে ওঠার সূত্রপাত। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উঠে আসে প্রখ্যাত পালাকার ও নাট্যকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা। তিনি নিজেই জানালেন ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমের জোরে এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র আকর্ষণীয় হওয়া ও তার ভূমিকায় অভিনয়ের জেরেই দর্শকদের কাছে আমি জনপ্রিয় হতে সক্ষম হয়েছি। এই চরিত্রচিত্রণই আমাকে পশ্চিমবাংলায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের তেরোটি পালার আমি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছি। এমন এক উজ্জ্বল অভিনেত্রীর প্রিয় মাধ্যম যাত্রা, কারণ তিনি দর্শকের সামনে খোলাখুলিভাবে অভিনয় করতে চান এবং তাতেই প্রকৃত অভিনয় দক্ষতার প্রকাশ পায়। যাত্রায় আসার আগে দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে অভিনয়ের সুযোগ এসেছে। করেছেনও। কিন্তু ওই জগতের কালোদিকটা ওঁর মনপসন্দ নয় মোটেই; উপরন্তু ক্যামেরাটা তেমন টানে না। যাত্রায় বিভিন্ন দলে অভিনয় করলেও দীর্ঘ তেরো বছর ধরে অনল চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করে চলেছেন। এখনকার যেসব পালায় অভিনয় করেন, তা পালাকার অনল চক্রবর্তীর লেখা। অনল সম্পর্কে তিনি বলেন : খুবই গুণী অনল। অভিনয়, গান, আবৃত্তি ও পালা রচনায় অত্যন্ত দক্ষ। এছাড়া , অভিনয় শিক্ষার একজন নির্দেশক তো বটেই। ও আমার জীবনে ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। আমার খুব ভাল বন্ধু, পারিবারিক বন্ধুও।

বিবাহিতা কাকলির স্বামী মৃদুল রক্ষিত যাত্রাপ্রেমিক। তাঁর নিজস্ব দল ছিল। যাত্রা ভালবাসেন, কিন্তু সরাসরি যুক্ত নন।

সারাজীবনে যাত্রা এখন ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন— চলনে বলনে সাজে শুধুই অভিনীত চরিত্রকে স্মরণ মনন। তিনি মা ও অনলের নানান নির্দেশ পেলেও নিজের অন্তর্নিহিত বোধ দিয়ে কাজ করে যান। পরবর্তী প্রজন্ম, যারা যাত্রায় অভিনয় করতে আসছে বা করতে আগ্রহী, তাদের জন্য কিছু সাজেশন হিসেবে জানালেন— পরবর্তী যারা অভিনয় করছে, তাদের জন্য আমার সাজেশন হলো, সর্বপ্রথম জীবনে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে হবে। পড়াশোনা করতে হবে। শুধুমাত্র দলে চাকরি করছি মনে করলে উন্নতি হবে না। যাত্রার প্রতি ভালবাসা থাকতে হবে আর ডেডিকেশন।

বিনোদনের আধুনিকতম নানা চমকপ্রদ মাধ্যম এখন দর্শকের মন কাড়ছে, সেক্ষেত্রে যাত্রা অনেকটাই সেকেলে বা তার স্থান থাকবে কিনা— এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, যাত্রা কোনদিনই বন্ধ হবে না, কারণ, গ্রামবাংলার মানুষ এখনও যাত্রার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। তবে হ্যাঁ, নতুন জুটি বা নুতন দক্ষ শিল্পী সেভাবে তৈরি হচ্ছে না। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে যাত্রামোদীদের।

তিন মাসে খেউড় রাজনীতির কোর্স চালু করুন

মাননীয় অনিল বসু
সি পি এম কার্যালয়, আরামবাগ,
মহাশয়,

আপনার বাড়ির ঠিকানা জানা নেই স্যার। তাই পার্টি অফিসেই চিঠি পাঠালাম। কিন্তু এখন তো আবার তিন মাসের জন্য পার্টি আপনাকে সাসপেন্ড করেছে। এই অবস্থায় পার্টি অফিসে পা রাখা যায় কি? জানি না। আসলে আপনাদের দলীয় রীতি-নীতি নিয়ে বিশেষ পড়াশুনা নেই আমার।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে দলের মুখ পুড়িয়ে ছিলেন। এছাড়াও দুর্নীতি ও আচরণগত সমস্যার নানা অভিযোগ নাকি জমা পড়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। বলা হয়েছে আর্থিক অনিয়ম ও আচরণগত সমস্যার অভিযোগে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড হচ্ছেন অনিল বসু। শেষপর্যন্ত ভোট রাজনীতির জুজু কাটিয়ে সিপিএম ব্যবস্থা নিল আপনার বিরুদ্ধে। কিন্তু যা যা অভিযোগ সবই কিন্তু অনিলবাবু যখন আপনারা ক্ষমতায় ছিলেন তখনকার। অনেক আগে দলের দায়িত্ব আর এক অনিল বিশ্বাসের হাতে থাকার সময় থেকেই আপনি অভব্যতার জন্য অভিযুক্ত। কিন্তু এতদিন আপনাদের লেজে পা দেওয়ার সাহস পেত না দল। কারণ, আপনারাই তো ছিলেন দলের ক্ষমতায় টিকে থাকার সম্পদ। আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাটে খুন-খারাপির রাজনীতি তো আপনাদের আড়াল থেকেই করেছে আলিমুদ্দিন। কিন্তু এখন ক্ষমতা হারানো বুদ্ধবাবুরা শুদ্ধিকরণের পালে হাওয়া দিতে বধ করেছেন আপনার মতো, বিনয় দত্তের মতো পার্টির একনিষ্ঠ সেবকদের। এককালের সম্পদই আজ যেন বোঝা।

অনিলবাবু এবার আপনার জানা কথাই একটু বিবৃত করছি। ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের তৎকালীন বিরোধীনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে দলের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করেছিলেন সেটা ঠিক আছে। আরামবাগের প্রাক্তন সাংসদ তথা দাপুটে নেতা হিসেবে নিজেকে হুগলি জেলার ডিফ্যাক্টো সম্পাদক হিসাবেই তুলে ধরতে পছন্দ করতেন আপনি। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে হারলেও জেলায় আধিপত্যের রাজনীতি কায়েম রেখেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করে দলকে বিপাকে ফেললেও তাই সেযাত্রায় খুব বেশী সাজা হয়নি আপনার। আসলে সাহসই হয়নি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পিড়াপিড়িতে কোনওরকমে ভুল স্বীকার করেই অশালীন মন্তব্যের দায় ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলেন। নির্বাচনী রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় সিপিএমও এনিয়ে খুব একটা উচ্চবাক্য করেনি। তবে এটা ঠিক যে দলীয় কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের মনে প্রচুর অভিযোগ ছিল আপনার সম্পর্কে। সরাসরি রাজ্য দফতরেও পৌঁছোয় বেশকিছু অভিযোগ। সেইসব অভিযোগেরই জের সামলাতে শেষ পর্যন্ত তদন্ত কমিটি গড়তে বাধ্য হয় সিপিএম। সেই তদন্ত কমিটির সুপারিশ মেনেই এবার সাসপেনশনের শাস্তি কার্যকর করল দল। কিন্তু সেটাও ক্ষমতা হারানোর পর।

আমার জানেন মায়া হচ্ছে। কথায় আছে না হাতি খানায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। আপনার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে যাঁরা এতদিন হাজার বার ভেবেও মুখে কুলুপ আঁটতেন সেই আর এস পি, ফব-র নেতারাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ভাবটা এমন যেন অনিল বসু তিন মাস সিপিএমের বাইরে থাকলেই যাবতীয় শুদ্ধিকরণ হয়ে যাবে। পারলে আপনাকে ওঁরা কোনও সংশোধনাগারে (কারাগার ভাববেন না প্লিজ) পাঠাতে চায়।

আসলে জানেন তো সামনেই পঞ্চায়েত ভোটে ঘুরে দাঁড়াবার হাস্যকর স্বপ্ন দেখছে আলিমুদ্দিন। আর তাই এত সংস্কারের উদ্যোগ। এতদিন ভোট রাজনীতির সঙ্গে আপোষ করেই আপনাদের অনেক বেয়াড়া হাবভাব সহ্য করেছেন বুদ্ধ-বিমানরা। ক্ষমতা হারানোর পর দলের অভ্যাসেরই পরিবর্তন ঘটাতে চান শীর্ষনেতৃত্ব। অর্থাৎ ভোট রাজনীতির স্বার্থের দিকে তাকিয়েই সাসপেনশনের এই সিদ্ধান্ত।

আপনি একা নন, সরাসরি শাস্তি না পেলেও থোতা মুখ ভোঁতা হয়েছে উত্তরের অশোক ভট্টাচার্যের আর দক্ষিণের রেজ্জাক সাহেবের। দু'জনেই অনেক আশা করেও দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে জায়গা পেলেন না। সংখ্যালঘু মুখ হিসাবে দৌড়ে থাকলেও শিকে ছিড়ল না মইনুল হাসানের। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলে বারবারই বিরাগভাজন হয়েছেন রেজ্জাক মোল্লা। নিজেও রাজ্য কমিটির বৈঠক এড়িয়ে গিয়ে বিতর্ক বাড়িয়েছেন। সব মিলিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে তাকে রাখার ব্যাপারে ভরসা দেখাতে পারেননি। আলিমুদ্দিনের আস্থাভাজন হিসাবে পুরস্কৃত হলেন অনেকটা জুনিয়র সুজন চক্রবর্তী, অমিয় পাত্র।

তাই মন খারাপ করবেন না। দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে যাবে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পুরনো মামলা খোঁচাতে শুরু করেছেন তাতে দলীয় সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে আবার সত্যিকারের সংশোধনাগারে না ঢুকতে হয়। তবে আপনার মুখ আপনাকে বাঁচিয়ে দেবে। তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে অনিল বসু তৈরির কাজে নেমেছে তাতে খেউড় রাজনীতির অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবেও স্বীকৃতি পেতে পারেন। এমনকী বঙ্গবিভূষণ মিলে গেলেও আশ্চর্য হব না। ঘরে বসে না থেকে এই তিন মাস প্রাইভেট টিউশন চালু করে দিতে পারেন। আপাতত ছাত্র না মিললেও ছাত্রনেতা 'প্রফেসর' শঙ্কু তো আছেই।

ভালো থাকবেন।

—সুন্দর মৌলিক

অতিথি কলম

জি পার্থসারথি

মার্কিন সেনা প্রত্যাহার

অস্থিরতা সৃষ্টি করবে আফগানিস্তানে

সম্প্রতি আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার ও তালিবানদের সঙ্গে তথাকথিত ‘আলোচনার’ ব্যাপারে আমেরিকা বেশ বিভ্রান্তিকর সংকেত দিচ্ছে। এদিকে উত্তর দিক দিয়ে আফগান-মার্কিন সৈন্যদের সরবরাহ পথ খোলা রাখলেও মধ্য এশিয়ায় আমেরিকান ঘাঁটিগুলির উপস্থিতি নিয়ে রাশিয়ানরা বেশ চিন্তিত। আবার সাম্প্রতিক অতীতে তালিবানদের শত্রু তালিকায় রাখলেও আফগানিস্তানের মাটি থেকে ক্রমাগত অন্তর্ঘাত ও অস্থিরতা ছড়ানোর অভিযোগে ইরান আমেরিকার অভিসন্ধি মোটেই ভালো চোখে দেখছে না। পক্ষান্তরে, তারা তালিবানদের সঙ্গেই সহমত পোষণ করতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে ‘ন্যাটো অ্যালায়েন্সের’ বাইরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এযাবৎ আমেরিকার মিত্র পাকিস্তান কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বে আতঙ্কবাদের মদতদাতার তকমা অর্জন করেছে। তাই পাকিস্তান সবসময় চাইছে আমেরিকানরা যেন চিরকালের মতো আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে ভারত তুর্কমেনিস্থান থেকে আফগানিস্তান-পাকিস্তান করিডর হয়ে গ্যাস পাইপলাইন দেশে নিয়ে আসার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে এবং আফগানিস্তানের কয়লা লৌহ আকরিক তামা ও সোনার মতো খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত।

আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি জো বিডেনের সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী তালিবানরা আন্তর্জাতিক আতঙ্কবাদী আল কায়দার সমগোত্রীয় নয়। তাই তাদের সঙ্গে আলোচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই হতভম্ব হয়ে গেছেন, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আকাশ থেকে পড়েছে। ওবামা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী গত গ্রীষ্মে তালিবানী নেতা মোল্লা ওমর আলোচনায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখানে স্মর্তব্য, আগেকার মার্কিন শর্ত (১) তালিবানদের সব রকমের হিংসা পরিত্যাগ করতে হবে, (২) তাদের আফগান সংবিধানের আনুগত্য মেনে নিতে হবে —এই দুই শর্তকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলে অনেকেই অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখেছেন, কুখ্যাত আন্তর্জাতিক আতঙ্কবাদীদের তালিকা থেকে বেশ কিছু কট্টর তালিবানী নেতার নাম অবলীলায় বাদ দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত সম্মানিত প্রখ্যাত পাকিস্তান-বিশেষজ্ঞ মালিক আজিজ আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় তালিবানদের শর্তগুলি প্রকাশ করেছেন। জানা গেছে, তালিবানরা (১) আফগানিস্তানের প্রতিবেশী কোনও দেশ এবং (২) যে দেশের সৈন্য আফগানিস্তানে মজুত আছে এমন কোনও দেশেই আলোচনায় বসবে না। (৩) গত দুই দশক ধরে তালিবানদের প্রতি আক্রোশ দেখিয়েছে এমন দেশও আলোচনার যোগ্য জায়গা বলে গণ্য হবে না। (৪) তালিবানরা ইসলামী ‘পরিবার’-এর বিরুদ্ধে যায় এমন কোনও শর্ত মানবে না। সর্বোপরি যে কোনও সময় আলোচনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার তাদের থাকবে।

এই পটভূমিতে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব লিওন পানেট্টা ঘোষণা করেছেন যে, ২০১৩-কে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর বলে ধরতে হবে। কেন না এই বছরের মধ্যেই আমেরিকা সরাসরি সংঘর্ষের পথ থেকে সরে ‘প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও সহযোগিতার’ কৌশল নেবে। এই পথ পরিবর্তন ওবামার পূর্ব ঘোষিত ২০১৪ থেকে এক বছর এগিয়ে আনা হচ্ছে। পানেট্টার ঘোষণা অনুযায়ী আমেরিকা ২০১৪ সালে ঘোষিত দিশা পরিবর্তনের ফলগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতে আফগানিস্তানে আরও স্থায়ী উপস্থিতির রাস্তা পরিষ্কার করে নিতে চায়। আমেরিকান প্রতিরক্ষা সচিবের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৪ সালের পরে সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করার সক্রিয় ব্যবস্থা (Center Terrorism Operation) নেওয়ার উপরই সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই আফগানিস্তানের জাতীয় সেনাবাহিনীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থ সাহায্য দিয়ে আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করা

হবে। আমেরিকার আফগান বিশেষজ্ঞ আধিকারিকরা সি আই এ-র বিপুল উপস্থিতি চান। যদিও আমেরিকার মধ্যে এর বিরুদ্ধ মতও রয়েছে। অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে টাকা ঢালার ব্যাপারটা ভালোভাবে নিচ্ছেন না। তাঁদের মতে ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে সর্বস্বান্ত। শূন্য স্থান ভরাতে তেলকুবের আরবের 'গাল্ফ স্টেট'গুলি বা জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এই ব্যাপার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে এমনটা ধরে নেওয়া অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না।

সি আই এ-র ভুতপূর্ব কর্মকর্তা ব্রুস রিডেল যিনি ওবামা প্রশাসনের আফগান পরিকল্পনার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর মত অনুযায়ী তালিবানদের সঙ্গে আলোচনার সাফল্য পাওয়া (যদি আদৌ পাওয়া যায়) অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী ছক। তালিবানরা ক্ষমতায় থাকা কারজাই সরকারকে বেআইনী (illegitimate) ও পশ্চিমের চাপিয়ে দেওয়া বলেই গণ্য করে। তাদের হাতে যে প্রচুর সময় আছে, তড়িঘড়ির কোনও দরকার নেই তা ওবামার সৈন্য ও সামরিক তৎপরতা প্রত্যাহার সূচী থেকেই তারা আন্দাজ করে নিয়েছে। অন্যদিকে হামিদ কারজাই কিন্তু তালিবানদের সঙ্গে কাতারে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনার ব্যাপারে অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে সচিব রিডেল আসন্ন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী 'মিট রোমনীর' তালিবানদের সঙ্গে আমেরিকান প্রশাসনের আলোচনার ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতার কথা প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই আফগানিস্তানে ওবামার সেনা কর্তারা গুলি-গোলা চালানো থেকে বিরত থাকবেন।

এই সব ঘটনা-পরম্পরা থেকে পরিষ্কার যে আফগানিস্তানে আগামী দিনে নীতি-নির্ধারণে বেশ অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। এর কিছুটা প্রমাণ এর মধ্যেই দেখা গেছে। আফগান জাতীয় বাহিনী পাকিস্তান উপজাতি অধ্যুষিত দক্ষিণ আফগানিস্তান সীমান্ত এলাকায় তালিবানদের পেছনে ধাওয়া করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তালমিল বা তৎপরতা দেখাবার চেষ্টা করেনি। এ থেকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুমান করা ভুল নয় যে, আমেরিকান উপস্থিতি সত্ত্বেও তালিবানরা দক্ষিণ আফগানিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের কব্জায় রেখে ঐতিহাসিক ডুরান্ড লাইনের নিরাপদ আস্তানা থেকেই অপারেশন চালাবে।

এই আন্তর্জাতিক পটভূমিতে আমাদের মতো দেশ যাদের আফগানিস্তানের সঙ্গে বিরাট ভবিষ্যৎ সম্পর্ক জড়িয়ে আছে, তাদের পরিস্থিতির ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভবিষ্যতে আফগানিস্তান যেন আবার 'জিহাদী সন্ত্রাসবাদীদের' ডেরা না হয়ে ওঠে সেটা নিশ্চিত করা সব থেকে জরুরি।

এমন পরিস্থিতিতে আমেরিকাকে হয়ত আবার ভিয়েতনাম নীতির পুনরাবৃত্তি করে—যারা তাদের পাশে থেকে সাহায্য করেছিল তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালাতে হবে। না হলে পাকিস্তানকে দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই আন্তর্জাতিক পটভূমিতে আমাদের মতো দেশ যাদের আফগানিস্তানের সঙ্গে বিরাট ভবিষ্যৎ সম্পর্ক জড়িয়ে আছে, তাদের পরিস্থিতির ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভবিষ্যতে আফগানিস্তান যেন আবার 'জিহাদী সন্ত্রাসবাদীদের' ডেরা না হয়ে ওঠে সেটা নিশ্চিত করা সব থেকে জরুরি।

আশার কথা, দিল্লি ইতিমধ্যেই তুর্কমেনিস্থান- আফগানিস্তান- পাকিস্তান- ভারত ব্যাপী ১৬৮০ কিমি. পাইপ লাইন সংক্রান্ত ভারতে গ্যাস সরবরাহের চুক্তিটি কার্যকর করতে পাকিস্তানকে রাজস্ব দিতে রাজী হয়েছে। প্রস্তাবিত টি. এ. পি. আই. (TAPI) পাইপ লাইন আফগানিস্তানের হিরাট, লস্কর-গা, কান্দাহার প্রভৃতি অঞ্চলের ওপর দিয়ে আসবে। ২০১৪-১৮ সালে বাস্তবায়িত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও অনেক কিছুই নির্ভর করবে প্রস্তাবিত সময়ে (১৭-১৮ সালে) দক্ষিণ আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর। অনেকগুলি ভারতীয় কোম্পানিকে সম্প্রতি যৌথভাবে (Consortium) উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানের হাজিকাফ প্রদেশে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন লৌহ-আকরিক সমৃদ্ধ খনিগুলি থেকে আকরিক সংগ্রহের বরাত দেওয়া হয়েছে। ওই একই অঞ্চলে আফগানিস্তানের প্রথম ইস্পাত কারখানাটি ও একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা চলছে। জাবুল অঞ্চলে ও ভবিষ্যতে ইরানের চাবাহার বন্দরে—লৌহ আকরিক পৌঁছে দিতে ভারত ইতিমধ্যে ৯০০ কি.মি. দীর্ঘ রেল লাইন নির্মাণে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

এই কর্মকাণ্ডগুলি সফল করে তুলতে ইরানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় আমাদের উপস্থিতি প্রমাণ করতে ইরানের সাহচর্য জরুরি। এই কারণেই খনিজ সম্পদ লৌহ আকরিক, কয়লা সোনা, থেকে শুরু করে ইস্পাত বা রেলের প্রস্তাবিত সব প্রকল্পগুলিকেই ইরান তো বটেই এমনকী জাপান ও রাশিয়াকেও জড়িয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। এত সব পরিকল্পনা অনেকটাই নির্ভর করবে পাকিস্তানের আফগানিস্তান ও ভারতে 'জিহাদী সন্ত্রাসবাদকে' প্রশ্রয় দেওয়ার রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে সরে আসার ওপরে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পাকিস্তানের চিরাচরিত ও বর্তমান বলবৎ থাকা সামরিক মানসিকতায় এরকম কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।

(লেখক বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ও স্তম্ভলেখক)

বাংলাদেশে অস্থিরতা

বিপদটা শুধু হাসিনার নয়, ভারতেরও

সাধন কুমার পাল

বাংলাদেশ এখন একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে। কারণ পাকমনস্ক খালেদা জিয়া ও তাঁর জোটসঙ্গী জামাত নেতারা যেনতেনপ্রকারেণ তিন চতুর্থাংশের বেশি আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেদেশের গণতন্ত্রকে পদ্মার জলে নিক্ষেপ করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না। দলের সর্বোচ্চ

নেত্রী হিসেবে বেগম জিয়া সাধারণত তাঁর দল বিএনপি বা চারদলীয় জোটের সমস্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত থাকেন না। কিন্তু গত কয়েক মাসে ওঁর দলীয় ও জোটের এমন কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচী নেই যাতে তিনি যোগ দেননি। বেগম জিয়ার এই অতি সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠেছে ওই দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্র ইসলামি সংগঠন হিযবুত তাহরির ও জামায়েত ইসলাম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবি নিয়ে জঙ্গি কর্মসূচী ঘোষণা করলেও বাংলাদেশের বিরোধীজোটের মূল লক্ষ্য যে খালেদা জিয়ার পুত্র যুগল তারেক ও কোকো সহ বিএনপি-জামাত জোটের ডজন খানেক নেতার বিরুদ্ধে চলতে থাকা ভয়ংকর সব ফৌজদারি মামলা বানচাল করা, শেখ হাসিনার উপর গ্রেনেড হামলা ও চোরাপথে ১০ ট্রাক চিনা অস্ত্র

ভারতকে জড়িয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রচারের ধরন দেখলে এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশের এই মৌলবাদী শক্তিগুলি অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে শেখ হাসিনা সরকার নাকি ভারতের তাঁবেদার সরকার এবং এই সরকারের মূল উদ্দেশ্য নাকি সিকিমের মতো বাংলাদেশকেও ভারতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া।

পাচারের মামলা ভন্ডুল করা, সেইসঙ্গে যুদ্ধপরাধীদের বিচার স্তব্ধ করে দিয়ে শেষ বিচারের অপেক্ষায় থাকা '৭১-এ ভয়ঙ্কর গণহত্যা ও নারকীয় ঘটনা সংগঠিত করার দায়ে অভিযুক্ত গোলাম আজম সহ দলের তিন নেতাকে ছাড়িয়ে আনা— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাংলাদেশের বিরোধী জোটের বিভিন্ন রকম প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচী ছাড়াও ১৯৭৫-এর শেখ মুজিবের হত্যার মতো গোপন রক্তাক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনাও যে রয়েছে এবিষয়টিও এখন প্রকাশিত। কিছুদিন আগে শেখ হাসিনা তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের অপপ্রয়াস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বানচাল করে দিয়েছেন। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ৮৬ জন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এতে মরিয়া হয়ে ওঠা খালেদা জিয়ারা যে দমে গিয়েছেন তা নয়। 'ভারতের দালাল' শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সর্বসমক্ষে নিরন্তর সেনাবিদ্রোহের ডাক দিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমানে ঘটতে থাকা ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে এটা স্পষ্ট হবে যে ২০০৮-এর ২৯ ডিসেম্বরের সেই ঐতিহাসিক নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠিত হওয়ার দু'মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ যে বি ডি আর বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল তার উদ্দেশ্যও ছিল এই সরকার-কে উৎখাত করা। সে সময় শেখ হাসিনা শক্তি প্রয়োগের পথ পরিহার করে বিদ্রোহীদের উদ্দেশে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে রাজনৈতিক ভাবেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনলেও সেনাপ্রশাসনের মধ্যে পাকমনস্ক মৌলবাদী সেনাকর্মীরা যে বহাল তবিয়তেই সুযোগের

অপেক্ষায় ছিল সেটা আজ স্পষ্ট। হাসিনার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও ধৈর্য সে সময় দেশে-বিদেশে প্রশংসা পেলেও যে প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা সেভাবে হয়নি তা হলো বিপুল জনসমর্থনের জেরে নবগঠিত একটি শক্তিশালী সরকারকে বিডিআর বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য নায়কেরা টলিয়ে দেওয়ার কর্মসূচী নেওয়ার সাহস পেয়েছিল কোথা থেকে?

রিপোর্ট বলছে বিএনপি-জমায়েতের চারদলীয় জোট শাসনের জামানায় খালেদা জিয়ারা ইসলামের নামে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর জন্য '৭১-এর রাজাকার- আলবদর-আলসামসের মতো শতশত জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। সেই সঙ্গে সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত মৌলবাদীরাই যে জনতার দরবারে প্রত্যাখ্যাত খালেদা জিয়াদের আসল শক্তির উৎস এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলাদেশের একাধিক গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে যে হরকাতুল আল ইসলামি বাংলাদেশ শাখা (হুজিবি), বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিরা, যুদ্ধাপরাধী চক্র, হিযবুত তাহরির ও ভারতের বেশ কয়েকটি উগ্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তাদের কর্মসূচি রূপায়ণের রাস্তায় গণতন্ত্রের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ককে কাঁটা হিসেবে দেখছে। সেজন্য শেখ হাসিনা ও ভারত এদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ওই দেশের গোয়েন্দারা আরও বলছেন আফগান ফেরত মুজাহিদদের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হুজিবির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লিগের নেতৃত্ব স্থানীয়দের হত্যা করে বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে ভারতে প্রভাব বিস্তার করা। আর এক সময় বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা ভারতীয় জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে আবার সে দেশে আশ্রয় নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করা। তথ্য বলছে হুজিবি ২০০০ সাল থেকে এই উদ্দেশ্যে হাসিনা সহ আওয়ামী লিগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর আটবার হামলা চালিয়েছে। বাংলাদেশের গোয়েন্দারা বেশ কয়েকটি দেশের মদতে চলা নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরিরকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করছেন। কারণ এরা উগ্র ভারত বিরোধিতার পাশাপাশি বাংলাদেশের সেনা ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিজিবি) ছাড়াও সে দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নানারকম অন্তর্ঘাতমূলক প্রচার চালাচ্ছে।

ভারতকে জড়িয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রচারের ধরন দেখলে এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশের এই মৌলবাদী শক্তিগুলি অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে শেখ হাসিনা সরকার নাকি ভারতের তাঁবেদার সরকার এবং এই সরকারের মূল উদ্দেশ্য নাকি সিকিমের মতো বাংলাদেশকেও ভারতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। ভারত-বাংলাদেশের ট্রানজিট চুক্তি রূপায়িত হলে ভারত নাকি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নয়, উত্তরপূর্ব ভারতের আলফা-এনএসসিএনের মতো 'মুক্তিকামী মানুষদের সংগঠন'গুলিকে দমন করতে সৈন্যসামন্ত- গোলাবারুদ পাঠানোর জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করবে!

তিস্তা চুক্তির পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিত্য অশান্তি এদের হাতে ভারত বিরোধী প্রচারের হাতে-গরম ইস্যু। এরা একদিকে ভারতে জালনোট-মাদক-মারণাস্ত্র-মানুষ পাচারের জন্য, আবার ভারত থেকে গোরু থেকে শুরু করে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাচারের জন্য সীমান্তের দুদিকেই নিখুঁত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই দুষ্কৃতীরা এতটাই দুঃসাহসী যে ওরা কাজ হাসিল করতে অবলীলাক্রমে কাঁটাতারের বেড়া কাটছে, সীমান্তে বসবারকারী ভারতীয় এমনকী বি এস এফ-এর উপর আক্রমণ করতেও দ্বিধা করছে না। সীমান্তে কর্মরত মানবাধিকার সংগঠনগুলির বেশিরভাগই এদের এই নেটওয়ার্কের অংশ। যাদের কাজ হলো সীমান্তে চলতে থাকা অবৈধ ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বিএসএফ- এর যে কোনওরকম প্রতিরোধকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দেখানো। গত জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে এক বাংলাদেশি গোরুচোরের বিএসএফ-এর হাতে প্রহৃত হওয়ার দৃশ্যের ভিডিও যে ভাবে প্রচারিত হয়েছে তা বাংলাদেশি নাশকতাবাদী ছকেরই অঙ্গ— ভারতীয় গোয়েন্দারাও এমনটাই মনে করছেন। শুধু এটিই নয়, সীমান্তে যেকোনও বাংলাদেশি দুষ্কৃতীর মৃত্যু বা বিএসএফ-এর হাতে প্রহৃত হওয়ার ঘটনাকে ওই দেশে বড় করে তুলে ধরা হয়। যাতে এটা প্রমাণ করা যায় যে ভারত বন্ধু হিসেবে পরিচিত শেখ হাসিনা আসলে ভারতের এজেন্ট ও বাংলাদেশের শত্রু, কারণ ওদের ভাষায় ভারতের কিলিং স্কোয়াড বিএসএফ বাংলাদেশিদের অত্যাচার করলে এমন কি মেরে ফেললেও হাসিনার কিছু যায় আসে না।

২০০১ সালে মেঘালয় সীমান্তে দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৬ জন বিএসএফ জওয়ানকে বাংলাদেশের মাটিতে টেনে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে খুন করা হয়েছিল। তখনও শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন। ২০১০-এ হিলি সীমান্তে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা এক বিএসএফ জওয়ানকে কুপিয়ে খুন করে। মুর্শিদাবাদের ঘটনার বদলা হিসেবে ঘটনার কয়েকদিন পরেই ত্রিপুরা সীমান্তে এক ভারতীয়কে বিজিবির পাহারাদাররা বাংলাদেশের মাটিতে টেনে নিয়ে গিয়ে খুন করে। বসিরহাটের স্বরূপনগরের বাংলাদেশ সীমান্তে গত ৭ ফেব্রুয়ারি (২০১২) বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের আক্রমণে এক বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। বিএসএফ সূত্রের খবর দু'দেশের বন্ধুত্বের জেরে গুলি না চালানোর সিদ্ধান্তের ফলে ওদের উপর গত বছর ৪৯টি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে আর আহত হয়েছে ৬৯ জন। নতুন বছরের প্রথম মাসেই এই সংখ্যা দুটি যথাক্রমে ৬ ও ১২। এর থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে বাংলাদেশি নাশকতাবাদীরা সীমান্তে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে ভারতের পাশাপাশি শেখ হাসিনার উপরও আক্রমণ শানাচ্ছে? অথচ সীমান্তের এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে ভারত সরকার এমন কি ভারতের সংবাদ মাধ্যমও আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।

বছরের পর বছর ধরে বিএসএফের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠলেও এগুলির কতটা ষড়যন্ত্র আর কতটা এই বাহিনীর দুর্নীতি বা পেশাদারিত্বের অভাবের ফসল তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আজ পর্যন্ত ভারত সরকার মনে করেনি। ফলে বাংলাদেশি নাশকতাবাদীরা ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে একতরফা অপপ্রচারে এতটাই সফল যে লন্ডন থেকে প্রকাশিত গার্ডিয়ান পত্রিকা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে দক্ষিণ এশিয়ার বধ্যভূমি হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। ২০১০-এ কানাডা সরকার এক অবসরপ্রাপ্ত বি এস এফ আধিকারিককে ভিসা দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সহ বাংলাদেশের পরিস্থিতি কতটা আয়ত্তের বাইরে গেলে ভারত সরকার ও এদেশের মিডিয়া এই নিয়ে সচেতন হবে সেটাই বোধহয় এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

গোয়ায় এখন বর্ণময় সুশাসনের আবহাওয়া

মনোহর পারিক্কর

কিরণ তারে : মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসার একমাসের মধ্যে নিজেকে কর্মপ্রিয় প্রমাণ করছেন মনোহর পারিক্কর। তাঁর কয়েকটি সিদ্ধান্ত গোয়াকে উন্নতির পথে এগোবার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। গত ২ এপ্রিল তিনি পেট্রোলের উপর ভ্যাট (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স) অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। ২০ শতাংশ থেকে তা দাঁড়িয়েছে ০.২ শতাংশে। তাতে তেলের দাম সস্তা হয়ে লিটার পিছু ১১ টাকা দাঁড়িয়েছে। খনি বিভাগের প্রধান অরবিন্দ লোলায়েকার সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। বেনিয়মের জন্য ৯ এপ্রিল থেকে ১৪৪টি খনি সংক্রান্ত ব্যবসায়ীর কাজকর্মের ছাড়পত্র পাচ্ছে না। গোয়ার বড় আকর্ষণ পর্যটন শিল্প। সমুদ্র তট থেকে দূরে জমজমাট ক্যাসিনোগুলোয় প্রবেশ দক্ষিণা ২,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৪০০ টাকা করা হয়েছে। তবে খরচ বেড়েছে বিনোদন উপকরণের। মদ, তামাক আর নৈশ আহারের ব্যয় কয়েকগুণ বেড়েছে।

গোয়ার ২০১২-১৩ সালের বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ৯,৫৪৯ কোটি টাকা। পেট্রোলের উপর ভ্যাট কমিয়ে দিতে ১৪৫ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে রাজ্যের। খনি বিভাগ থেকে ২০০ কোটি টাকা আদায় হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি অনেক ভাবনাচিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। আমি চেষ্টা করছি ঘাটতি রাজস্ব পুনরুদ্ধারের জন্যে।'

মুখ্যমন্ত্রী পারিক্কর খনিসম্পদের উপর রাজ্যের নির্ভরতা কমাতে চান। তা কমে অর্ধেক হবে আগামী পাঁচ বছরে। রাজ্য জুড়ে ক্যাসিনো বা জুয়া সংস্কৃতির দাপটের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছেন একদল মানুষ। তাঁরা সংগঠিত হয়েছেন 'দ্য আম আউরৎ আদমি এগেইনস্ট গ্যামলিং' সংস্থার নামে। তাঁরা সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর ক্যাসিনোর প্রবেশ-দক্ষিণা কমানোর জন্য। তাঁদের আশা ছিল মুখ্যমন্ত্রী ক্যাসিনোগুলো বন্ধের ব্যবস্থা করবেন। বিরোধী দলে থাকার সময় সেরকম অঙ্গীকারও তাঁর ছিল। কিন্তু দেখা গেলো তিনি ক্যাসিনোর পক্ষেই সরকারি সিদ্ধান্ত নিলেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে একথা জানিয়েছেন আহ্বায়ক সাবিনা মার্টিনস।

মুখ্যমন্ত্রী সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ক্যাসিনোয় প্রবেশ-দক্ষিণা সবসময় এড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। ক্যাসিনো মালিকরা তাদের ক্রেতাদের টাকা দেয় নিজের থেকে। দু'হাজার টাকা প্রবেশ-দক্ষিণার দরুন রাজ্য গতবছর পেয়েছে ৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। সমুদ্রতট থেকে দূরের ক্যাসিনোর ছাড়পত্র ব্যয় বাড়ানোয় আয় পাঁচ কোটি থেকে সাড়ে ছ'কোটি টাকা হয়েছে। আর সমুদ্রতটের ক্যাসিনো থেকে ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে আড়াই কোটি দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে দাঁড়াবে ৩০ কোটি।' তিনি স্থানীয় ক্যাসিনোতে প্রবেশে বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করার কথা ভাবছেন।

আত্মপক্ষ সমর্থনে আরও বলেছেন, 'পৃথিবীর সব দেশে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্যাসিনোতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে।'

পারিক্কর ভূমিপুত্রদের আরও অধিকারের পক্ষে কথা বলছেন। গোয়ার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্যে অর্ধেক কাজ সংরক্ষিত রাখার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যের হাতে কোনও জমি থাকছে না।' কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি গোয়াকে সুনজরে দেখছে না।

রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতা পেয়েছে তার কারণ এবার প্রথম ক্যাথলিকরা বিজেপি'কে ভোট দিয়েছে—অভিমত বিশ্লেষকদের। পারিক্কর পুরোদস্তুর স্বয়ংসেবক। বলা হয়েছে তিনি হিন্দু সমাজ আর গির্জার মধ্যে চমৎকার সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। পারিক্কর বলেছেন, 'দুই সম্প্রদায়কে কাছাকাছি আসা দরকার।' তিনি নিজে গোয়ার আর্চবিশপ ফিলিপ মেরি ফেরাও-এর প্রতিবেশী। নতুন মুখ্যমন্ত্রী দুটি মন্ত্র যোগ করেছেন তাঁর কাজে—অনাড়ম্বর ও দৃঢ়তা। পানাজি থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে মাপুসাতে নিজের বাড়িতে থাকেন। বলেছেন, 'আমার সরকারি বাসস্থানের প্রয়োজন নেই যখন নিজের একটা থাকার জায়গা আছে।'

তিনি ঘুরছেন পুলিশি নিরাপত্তা ছাড়াই। বলেছেন, 'আমি কারও সঙ্গে কখনও দুর্ব্যবহার করিনি। আমার নিরাপত্তার দরকার নেই।' নিজের ঘরের আলো পাখার সুইচ নিজে বন্ধ করেন। ফাইলের দড়ির ফাঁস নিজে খোলেন। যুক্তি তাঁর, 'আমার সহকারীরা নিজেদের কাজ করেন। আমি নিজের কাজ করি। কোন নিয়ম আছে কি, এসব কাজ মুখ্যমন্ত্রীর করা বারণ?'

পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রী দিগম্বর কামাথ সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি আমাকে আর আমার দলকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন। এটা বিরোধিতা, বদলা নয়। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ পুষে রাখিনি। তিনি বয়সে অনেক ছোট।' কামাথ তাঁর মন্ত্রিসভায় খনিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ২০০৫-এ বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তাঁর সরকারকে ফেলে দেন।

গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে চান রাজ্যে লোকায়ুক্ত প্রতিষ্ঠা করতে। কেন্দ্র সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছেন। দুটি বিভাগ থেকে ছাড়পত্র মিলেছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর এখনও ছাড়পত্র দেয়নি। পারিক্কর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবার পর রাজ্য জুড়ে কাজের বন্যা বয়েছে. সরকারি অফিসাররা ছুটির দিনেও থাকছেন। কাজের মত্ততা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

সংবাদঋণ : ইন্ডিয়া টু-ডে।

ডেভিড বাক্সটার (বাঁদিকে) ও তাঁর স্ত্রী যুমি।

করুণাধারায় এসো

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০১১-র ১১ মার্চ। দুঃস্বপ্নের এই দিনটা জাপানবাসী কোনওদিনও ভুলবেন না কিংবা ভুলে যেতে চাইবেন শুধু এই প্রার্থনায় অতি বড় শত্রুকেও যেন এই দিন দেখতে না হয়। ওইদিন জাপানের উত্তরপূর্ব উপকূলে আছড়ে পড়েছিল সুনামীর ঢেউ এবং মারা গিয়েছিলেন ১৯,০০০-এর মতো মানুষ। আর এতে কত মানুষের ক্ষয়ক্ষতি যে হয়েছে তার তো লেখাজোকাই নেই। এমনই এক হতভাগ্য জাপানী কিশোরের নাম মিসাকী মুরাকামী। বয়স মাত্র ১৬ বছর। যৌবনের প্রারম্ভেই তার জীবনে নেমে এসেছে দুর্যোগ। প্রাণে হয়তো বেঁচেছে কিন্তু ঘরদোর এবং তার প্রাণাধিক প্রিয় একখানা ফুটবল ভেসে গিয়েছে সুনামীর তোড়ে। সমুদ্র যেমন অনেক কিছু নেয়, তেমনি কখনও-সখনও বোধহয় ভুল করে কিছু ফিরিয়েও দেয়। তবে মুরাকামী যা ফিরে পেয়েছেন তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি যেভাবে তা ফিরে পেয়েছেন তা বোধহয় রূপকথাকেও হার মানাবে।

মুরাকামী ফিরে পেয়েছে তার অতিপ্রিয় ফুটবলটিকে। হয়তো ভাবতে পারেন, যার জীবনে সবটুকুই গেল একটা ফুটবল ফেরায় তার কি এসে গেল। কিন্তু ১৬ বছরের একটা জীবন তো থেমে থাকতে পারে না। খড়- কুটোটুকু আঁকড়ে সে আবার পথ চলতে চায়। মুরাকামীর জীবনে এই খড়-কুটোটাই হলো সেই হারিয়ে যাওয়া ফুটবলটি। আর যেভাবে সেটি উদ্ধার হলো তাতে সব হারানো মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর পক্ষে অলৌকিক যুক্তির-ই অবতারণা করছে। প্রশান্ত মহাসাগরের একপ্রান্তে ঢেউ উঠেছিল সুনামীর, যে প্রান্তে অবস্থিত জাপান; সেই ঢেউ-এর আছালিপিছালি স্রোত পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় ৩০০০ মাইল (৫০০০ কিমি) দূরে আলাস্কায়, প্রশান্ত মহাসাগরের আরেকটি প্রান্তে। আর সেই স্রোতেই মুরাকামীর বলটি পৌঁছে যায় আলাস্কার একটি দ্বীপ— মিডলটন দ্বীপে যেটি মূল আলাস্কা থেকে ১১০ কিমি দক্ষিণে। বলটিকে দেখতে পান জনৈক আলাস্কীয়, পেশায় র‍্যাডার টেকনিশিয়ান, পোস্টিং— কাসিলফে, ডেভিড বক্সটার এবং তাঁর জাপানী স্ত্রী যুমি। বলটিকে দেখে তাঁদের মনে হয়েছিল জাপানে সুনামীর ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন নিয়ে যে বলটি ভেসে উঠেছে তার মালিকের খোঁজখবর করা দরকার।

কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। কারণ বলের মালিক জীবিত না মৃত তাই বা কে জানে? অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যুমি এক জাপানী সাংবাদিকের সাহায্যে হদিশ পেলেন বলের আসল মালিকের অর্থাৎ মিসাকী মুরাকামীর। বলটি মুরাকামীর কাছে আরও একটা কারণে 'স্পেশাল', যেহেতু ২০০৫-এ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে ছেলেবেলার স্কুল ছেড়ে উচ্চতর বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময় ওই বলটি উপহার পেয়েছিল সে। বলটির গায়ে যে উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তাগুলো সেদিন লেখা হয়েছিল, আজ তার প্রাসঙ্গিকতা যেন নতুন করে অনুভব করছেন মুরাকামী। এ ব্যাপারে সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদ হলো, যুমির সঙ্গে খুব ভাব জমে উঠেছে মুরাকামীর। সবকিছু হারানোর মাঝে ফুটবলটিকে পেয়ে মুরাকামীর উপলব্ধি— জীবন থেমে থাকে না। আর চলার পথে তার প্রাপ্তি ডেভিড-যুমির বন্ধুত্বের হাত।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো

বাংলা ভাষায় এই প্রথম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গাঁধিজীর সম্পূর্ণ জীবনী
রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের

মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী

একটি অকপট জীবনী, ১৫০

পোরবন্দর থেকে শুরু হওয়া গাঁধিজীর জীবন শেষ হয়েছিল রাজঘাটে। নানা বৈপরীত্যে ভরা ছিল সেই জীবন; সেই সব বৈপরীত্য নিয়েই রচিত এই ঐতিহাসিক জীবনী যা আপনাকে দ্রুতলয়ে টেনে নিয়ে যাবে শুরু থেকে শেষে। কোনও জীবনই একহারা নয়, প্রতিটি জীবনেই আছে নানা টানাপোড়েন, আপনি পৌঁছবেন এই সত্যে।

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, M-9830532858

প্রধানাচার্য চাই

সারদা শিশুতীর্থ, সূর্যসেন কলোনী, শিলিগুড়ির (পূর্বোত্তর ক্ষেত্রে বিদ্যাভারতীর প্রথম বিদ্যালয়) জন্য প্রধানাচার্য চাই।

—ঃ শিক্ষাগত ও অন্য যোগ্যতা ঃ—

 কমপক্ষে ‘স্নাতক’, আচার্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যে কোন শিশুতীর্থ বা শিশুমন্দিরে দশ বছর আচার্যরূপে কাজের অভিজ্ঞতা।
 সরকারি পি. এফ. ই. এস. আই. সি-র সুযোগ সুবিধা সহ আবাস ব্যবস্থা থাকবে।
যথা শীঘ্র আবেদনকারীকে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক,
সারদা শিশুতীর্থ
সূর্যসেন কলোনী, পোঃ—শিলিগুড়ি টাউন, পিন কোড—৭৩৪০০৪
দূরভাষ—(০৩৫৩) ২৬৯১৫৪৪, ৯৪৭৪৬৮৯৩৩১

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Mutton
Sabji Mix
kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper Powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ

মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপদ ব্রহ্মচারী ও প্রদীপলাল ঝা চক্রবর্তী।

সংবাদদাতা।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ ২২ এপ্রিল থেকে শিলিগুলি শহরে শুরু হয়েছে। ২০ দিন ধরে এই শিক্ষা বর্গ চলবে। এদিন বর্গের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনানন্দ আশ্রমের সন্ন্যাসী শ্যামাপদ ব্রহ্মচারী। তিনি বলেন, প্রথম গুরু আমাদের মা। দ্বিতীয় গুরু যেখানে ভূমিষ্ঠ হই অর্থাৎ ভারতমাতা। এটাই ভারতীয় সংস্কৃতি। চেতনা না হলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। পূর্ণতা প্রাপ্তিই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ২০ দিনের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সেই উদ্দেশ্যেই এবং তা সার্থক হোক। আগামী ভারতবর্ষ নতুন সুসন্তান পাবে।

উত্তরবঙ্গের ১৪টি জেলা (সাংগঠনিক) থেকে ৬৫ জন শিক্ষার্থী এই বর্গে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রবন্ধক ও শিক্ষক মিলিয়ে মোট ১০০ জন এই বর্গে যোগ দিয়েছেন। এই বর্গের বর্গাধিকারী— প্রদীপলাল ঝা চক্রবর্তী, বর্গ কার্যবাহ— আনন্দময় বর্মন, মুখ্যশিক্ষক— নরেন্দ্রনাথ বেরা এবং বৌদ্ধিক প্রমুখ— সমীরণ মাজি।

বর্গের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব ক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ১৯২৮ সালে প্রথম সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ শুরু। উদ্দেশ্য— কার্যকর্তা নির্মাণ। ২০ দিনের 'সঙ্ঘ সাধনা' আমরা পূর্ণ করবো। এখানে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। কিন্তু মনের মধ্যে কার্যকর্তার ছাপ পড়ে যাবে। আমাদের কাজ ঈশ্বরীয় কাজ। এই কাজকে সফল করার জন্য শিক্ষাবর্গের মাধ্যমে নিজেদের কার্যকর্তা হিসেবে গড়ে তুলুন।

নেত্রদান মহাদান

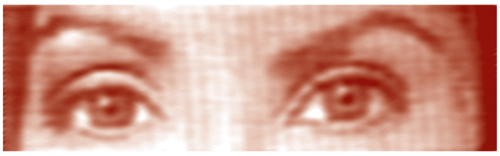

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature...................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

গানে কবিতায় স্মৃতিচারণে পূর্ণদাকে স্মরণ

দেবাশীষ লাহিড়ী ॥ গত ২২ এপ্রিল রবিবার কলকাতার নরেশ ভবনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে শতাধিক গুণগ্রাহী মানুষের উপস্থিতিতে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের কার্যকরী উপদেষ্টা সদ্য প্রয়াত পূর্ণচন্দ্র পুইতন্ডির স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি বিশিষ্ট অভিনেতা-নির্দেশক তপন গাঙ্গুলী। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপদেষ্টা সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক কেশব দীক্ষিত, অপর বরিষ্ঠ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, সংগঠনের অখিল ভারতীয় সহ নাট্যপ্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য পূর্বাঞ্চল প্রমুখ সুভাষ ভট্টাচার্য, ও অন্যান্য প্রাদেশিক কার্যকর্তাগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুরু বিশ্বাস এবং পূর্ণদার অগ্রজ হৃষিকেশ পুইতন্ডি, অনুজ শশাঙ্ক পুইতন্ডি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথমে স্মৃতিচারণ করেন সুভাষ ভট্টচার্য। তিনি বলেন, পূর্ণদা হঠাৎ চলে গেলেন কিন্তু তিনি আমাদের জন্য দুটি বড় জিনিস করে গেছেন। এর প্রথমটি হল আমাদের সকল সদস্য ও সদস্যার জন্মদিনে তাদের বাড়ীতে নটরাজের ছবি ও শুভেচ্ছা সম্বলিত একটি সুন্দর কার্ড পাঠানো— তাদের আনন্দ দেবার জন্য এবং দ্বিতীয়টি হলো স্বদেশী যুগে ভবানীদাসের সুরে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের 'সিডি' প্রস্তুত করে সকল শাখায় পাঠানো যাতে তারা নির্ভুল সুরে এই গান গাইতে পারেন।

কেশবজী বলেন, 'একে একে ছোটরা সবাই চলে যাচ্ছে, আর আমিই শুধু বসে আছি। অনেকটা মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের মতো অবস্থা। জানিনা ভগবানের কী ইচ্ছা।' এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে স্মৃতিচারণ করেন প্রদেশ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, পূর্ণদার বন্ধুস্থানীয় ডাক্তার চিন্ময় শীল, বিশিষ্ট সাংবাদিক অসীম মিত্র, প্রদেশের নৃত্যসম্পাদিকা সংযুক্ত সেনগুপ্তা, পূর্ণদার ছোট ভাই এবং সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি তপন গাঙ্গুলী। তপনদা বলেন, 'একজন সত্যিকারের মানুষ চলে গেলেন। জন্মালেই মানুষ হওয়া যায় না। প্রকৃত মনুষ্যত্বে উপনীত হতে গেলে প্রতিটি মানুষকে একটা দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করতে হয়। (For being A real man is a long journey) পূর্ণদা সেই পথে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন।' এছাড়া স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে পূর্ণদাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশিষ্ট কবি গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত, অমিতাভ মুখার্জী এবং শংকর ভট্টাচার্য। গানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রূপশ্রী দত্ত, তনুশ্রী মল্লিক, রুক্মিনী দত্ত, সাগরিকা মুখোপাধ্যায়, অমিত দে, ভরত কুণ্ডু, পারমিতা নিয়োগী এবং দেবাশিস লাহিড়ী। সবশেষে ভবানী দাসের সুরে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি চৈতালী মন্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সংযোজনায় ছিলেন ভরত কুণ্ডু।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

পুস্তক প্রসঙ্গ

‘আত্মশ্রদ্ধা’ একটি যুগোপযোগী গ্রন্থ

গোপাল চক্রবর্তী

‘‘আত্মশ্রদ্ধা’’ গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত মোট ২৪টি প্রবন্ধ ও ২২টি কবিতা আছে। গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ ‘‘মহাসত্যের অবদান স্বামী প্রণবানন্দ।’ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বীর সন্ন্যাসী স্বামী প্রণবানন্দের জীবনের আদর্শ ও ব্রতের উজ্জ্বল অধ্যায় এই প্রবন্ধে উদ্ভাসিত হয়েছে লেখকের নিজস্ব রচনা শৈলীতে। প্রবন্ধের মাঝে মাঝে এই গ্রন্থে কিছু কবিতাও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম কবিতা ‘মুক্তির সকাল’ কবিতাটিতে আধ্যাত্মিক ও ভক্তিরসের উন্মেষ ঘটেছে। ‘‘দিব্য অনুভূতির জন্য চাই অনুরাগ’’ শীর্ষক প্রবন্ধটি মানবজীবনের চরিত্র গঠনের জন্য একান্ত অনুকরণীয়। গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ ‘আধ্যাত্মিক সাধনায় দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা’-তে লেখক বেদবেদান্তের কঠিন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিজের ভাষায়, নিজের বিচারে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায়, বর্তমান সামাজিক জীবনের পরিকাঠামোয় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধ ‘শ্রদ্ধা’। মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ, নাগরিক কর্তব্যবোধ, সামাজিক সদ্ব্যবহার, মনুষ্যত্বের বিকাশ—এসবের জন্য আবশ্যক বিশ্বাসের উপর নির্মল শ্রদ্ধা। লেখক এই সত্য প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

এই গ্রন্থে সংযোজিত কবিতার একটি হলো ‘কলির মাতৃত্ব’। যুগে যুগে অসুর দলনী মায়ের কলিযুগে নিস্পৃহতার জন্য ক্ষোভ জানিয়েছেন কবি। গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধ ‘কর্মই মহান’। এই প্রবন্ধে সৎ কর্মের দিগ্‌নির্দেশ করেছেন লেখক সনাতন পদ্ধতিতে। ‘যদি আবার জন্ম হয়’ কবিতায় কবি একটি ফুল হয়ে জন্মগ্রহণ করার অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। ‘মনুষ্য জীবন’ গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধ। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, মূঢ় এবং মুমুক্ষু মানুষের স্বরূপ এতে ব্যক্ত হয়েছে। ‘ডেকে নিও’ কবিতায় কবির গুরুর কাছে আত্মনিবেদনের মনোভাব ফুটে উঠেছে। ‘মায়া অস্তিত্বেরই এক ব্যক্তিত্ব’ প্রবন্ধে লেখক মায়ার স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। ‘মানব সেবায় স্বামী প্রণবানন্দ’ প্রবন্ধে স্বামীজির মানব সেবার বিভিন্ন দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে। ‘সমাধির পথে’ কবিতায় মঠ মন্দিরের ভক্তিহীন আদর্শহীন ট্রাস্টের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ‘বিদ্যা ও জ্ঞানের নীতি’ প্রবন্ধে লেখক বিদ্যা ও জ্ঞানের স্বরূপ এবং অর্জনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। ‘এই কি সেই

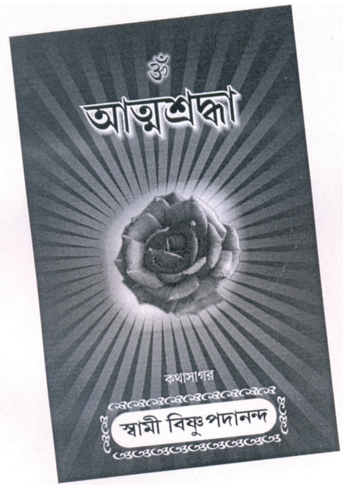

বৃন্দাবন’ প্রবন্ধে বৃন্দাবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং ভারতের এই শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রের প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লেখক। ‘শরীর ও আত্মার মাহাত্ম্য’ প্রবন্ধে শরীর ও আত্মা একে অন্যের পরিপূরক এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন লেখক। ‘গুরুগীত’ কবিতায় লেখক গুরু প্রণবানন্দের স্তবগান করেছেন’।

লেখক সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে মানব সভ্যতার লজ্জাজনক মহাকলঙ্ক স্বরূপ বৃদ্ধাশ্রমের করুণ চিত্র অংকন করেছেন ‘বৃদ্ধাশ্রম ও মানব সভ্যতা’ প্রবন্ধে ‘জগতের জন্য’ গ্রন্থের ত্রয়োদশতম প্রবন্ধে। জগতের জন্য মানবের কী করণীয় তা এই প্রবন্ধের উপজীব্য। ‘ওগো মা দানবদলনী মহামায়া’ প্রবন্ধে যুগে যুগে দানবদলনী অশুভশক্তির বিনাশকারিণী মহামায়াকে আসুরিক শক্তির বিনাশে আবির্ভূত হওয়ার জন্য লেখক আহ্বান করেছেন। মৃত্যুর অন্তরালে কিছু মানুষের দুর্বিষহ জীবনযাত্রার কথা লেখক বলেছেন ‘মৃত্যু’ প্রবন্ধে। ‘অন্তর্দাহ প্রথা কি মানবপ্রীতি?’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক আদর্শ মানবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ‘দীর্ঘশ্বাস’ একটি ছোটোগল্প। এই গল্পে এক বৌদি ও দেবরের নিষ্কাম ভালোবাসার সুন্দর চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। ‘আত্মা ও মৃত্যু’ প্রবন্ধে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ‘শাশ্বত অনুরাগ’ কবিতাটি স্নিগ্ধ অনুরাগের মূর্ছনায় মুখর। ‘কর্মের প্রান্তরে’ গ্রন্থের বিংশতিতম রচনা, একটি সরল গল্পের আড়ালে এক দার্শনিক তত্ত্ব এখানে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। ‘ভুজের ভূমিকম্প’ রচনায় গুজরাটের ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং পরবর্তী সময়ের মর্মান্তিক ঘটনা ও ত্রাণকার্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা সত্যি মর্মস্পর্শী, কবিতাগুচ্ছের কবিতাগুলিও ভালো। ‘বৈষ্ণোদেবী দর্শন’ রচনায় লেখকের কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে বলতে হয় লেখকের মাত্রাতিরিক্ত আহ্বান প্রবণতা রচনার গতিকে কখনো কখনো শ্লথ করেছে। ভাষা আরও সাবলীল হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। বানান বিভ্রাটও যথেষ্ট। মোট কথা কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও স্বামী বিষ্ণুপদানন্দের ‘আত্মশ্রদ্ধা’ গ্রন্থটি যুগোপযোগী।

‘‘আত্মশ্রদ্ধা’’।
স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ।
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
ডোডিয়া পাড়া, নর্মদা, গুজরাট

রঙ্গম

বাংলা শিশু নাট্যমেলা

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

'আমরা ভালোবাসার পাখি...এসো নাটক শিখি'—শিশু শিল্পীদের দ্বারা এই সমবেত সঙ্গীত দিয়েই সূচনা হোল 'এসো নাটক শিখি' সংস্থা আয়োজিত বাংলা শিশু নাট্যমেলার।

মেলার উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, ''আমার সাফল্য বিফলতা সবই শিশুদের মধ্যে কাজ করেই। শিশুদের বিশেষ গুণ হলো তারা সহজেই ভালোবাসতে পারে। অভিভাবকরা যে ছোটদের নাট্যচর্চার সঙ্গে আছেন এটা একটা বিরাট ব্যাপার এবং ধন্যবাদযোগ্য। স্বপ্ন, শ্রম, উদ্দীপনা নিয় এগিয়ে চলুন কর্ণধার ডঃ তাপস দাস।''

কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রী বিনয় ভৌমিক বললেন, ''অভিভাবকদের বিশেষ ভূমিকা থাকে শিশুদের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে। শিশুদের মানসিক মান উন্নীত হয় নাট্যচর্চার মাধ্যমে। স্বীকৃতি এবং বন্ধুদের মধ্যে বেঁচে থাকলে শিশুরা ভালোবাসতে শেখে, যা নাট্যচর্চার এক বিশেষ দিক।''

প্রকৃতিপ্রেম এবং দেশপ্রেমের আবেদন জানিয়ে শিলিগুড়ির শিশুনাট্যম প্রযোজনা করলেন, নাটক—'এসো মিলনের গান গাই।' নাটকের গল্পে স্কুলের একদল ছেলেমেয়ে জলপাইগুড়ির অরণ্যাঞ্চলে নাটকের মহড়া দিতে দিতে—গাছ, পশুপাখি এবং মানুষের মিলনের গান গাইলেন। নাটকটির রচয়িতা এবং নির্দেশক ছিলেন শ্রী দীপোজ্জ্বল চৌধুরী।

'এসো নাটক শিখি'র প্রযোজনায়, তাপস দাসের নির্দেশনায় অভিনীত হলো নাটক—'দলছুট'। অনাথ পথশিশুদের একটি আস্তানার শিশুদের বিভীষিকাময় জীবন কাহিনীর গল্প এই নাটকটি। একটি হারিয়ে যাওয়া শিশুর এই আস্তানায় আসাকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক আস্তানাবাসীর জীবনের কাহিনী উঠে এসেছে নাটকে। এই নাটকে খুদে অভিনেতারা মনস্পর্শী অভিনয় করেছেন।

অঙ্কুর বাটানগর প্রযোজনা করলেন নাটক—'সুরের যাদু'। নাটকে এক সঙ্গীতপ্রিয় রাজা ও এক কোকিলের গল্পের মাধ্যমে, অন্তরের গভীর থেকে মাতৃভাষায় যে গান গলা দিয়ে বেড়োয়, তার জয়গান করা হয়েছে। এই নাটকে আধুনিক সমাজের নানা বিষয়কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। রাজার সংলাপে শোনা যায় সরকারি কর্মচারীদের কাজে অনীহার কথা। এই সঙ্গে এও দেখানো হয় যে, রাজার তোষামোদি না করলে প্রকৃত প্রতিভাও স্বীকৃতি পায় না। নাটকে পাশ্চাত্য চটকদারি সঙ্গীতের মোহে যখন রাজা এবং জনগণ মোহিত, তখন কোকিল পাখি বলে, 'এ দেশের হাসি-কান্না, সুর সবই নকল। আসল সঙ্গীত এখানে অবহেলিত।' শেষে যখন চটকদার গানের গুঁতোয় রাজা কুপোকাৎ, তখন বাংলার প্রকৃত সুরের মূল্য রাজা বুঝতে পারল। এই নাটকে নির্দেশক সমীরণ ঘোষ আধুনিক সমাজের পাশ্চাত্য প্রীতিকে ব্যঙ্গ করেছেন।

বিষ্ণুপুর কিশোর বাহিনীর প্রযোজনায় অভিনীত হলো—'বাহাদুর ছেলে।' নাটকটি বীর নামক এক কিশোরের গল্প।

বীরের পিতা রাজার হাতে বন্দী। একশত স্বর্ণমুদ্রা দিলে তবেই তার পিতা মুক্তি পাবেন। বীর মুদ্রা নিয়ে চন্দ্রপুর রাজবাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। তারপর কীভাবে সে পিতাকে উদ্ধার করে ও জন্মান্ধ রাজকন্যাকে সারিয়ে তুলে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যাকে লাভ করে, তারই গল্প এই নাটকটি। নাটকে হরিণ, প্যাঁচা, ভূতের আবির্ভাবে নানা ঘটনার ঘনঘটা। এটি আদ্যন্ত ছোটদের মনোরঞ্জনের নাটক।

চাষী হারাধন কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকায় সাপে কাটা স্ত্রীকে হারায় এবং অশিক্ষার কারণে মহাজনের হাতে সর্বস্বান্ত হয়। পরবর্তীকালে সে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে লেখাপড়া শেখে এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়। তাই তার সাধ যে, তার একমাত্র পুত্র বড় হয়ে ডাক্তার হবে ও গ্রাম থেকে কুংস্কার হটিয়ে গ্রামের মানুষের সেবা করবে। এই নিয়েই ছিলো নাটক—'হারাধনের সাধ।'

বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে আজও যে গুণিন, ওঝা এদের দাপট চলছে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ তাদেরই রক্ষাকর্তা মনে করে জীবন বলি দিচ্ছেন, সেই বিষয়টি উঠে এসেছে এই নাটকে।

নাটকগুলিতে শিশু অভিনেতাদের পেশাদারি মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরা যদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নাট্যচর্চা চালিয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে এদের মধ্যে থেকেই আবার কোনও দেবশঙ্কর হালদার বা কৌশিক সেনদের মতো অভিনেতা-নির্দেশক উঠে আসবেন, এটা আশা করাই যায়। 'এসো নাটক শিখি' সংস্থার কর্ণধার ডঃ তাপস দাসকে অভিনন্দন জানাই শিশুদের মধ্যে নাট্যচর্চাকে ছড়িয়ে দেবার জন্য।

নোট বুকের রাইটার চাই

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রিকোর্স (কল্যাণী, গৌড়, বর্ধমান) ও চাকুরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাজেশন ভিত্তিক বই লেখার জন্য রাইটার চাই। যোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে শীঘ্র এস. এম. এস. করুন।

৯৮৩২০৪৩৫১৫, ৯৭৩৫৯৪৮৭৯০

শব্দরূপ-৬২৪ সপ্রতিভ মণ্ডল

১		২	■	■	৩		৪
■	■	৫	৬			■	
■	৭	■		■	■	■	
■	৮			■	■	৯	
১০		■	■	১১			■
	■	■	■		■		■
	■	১২			১৩	■	■
১৪			■	■	১৫		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. পৌরাণিক মুনিবিশেষ, ৩. অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর স্ত্রী, ৫. হাতের তেলো, মধ্যে নিযুক্ত, ৮. বামন পত্নী, ৯. নারায়ণ, ১০. অষ্টম গ্রহ, গ্রহণকালে যা সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে, ১১. বড়ো লেবুবিশেষ, প্রথম দুয়ে বাখারি, ১২. স্বর্গের গঙ্গা, ১৪. রত্ন-র কোমল ও কথ্য রূপ, ১৫. উর্মিলার স্বামী।

উপর-নীচ : ২. গলার গয়নাবিশেষ দেশি শব্দে, ৩. পশম, ৪. রামের শত্রু রাবণ, শেষ দুয়ে তৎসম জল, ৬. মনসামঙ্গলের গান, ৭. শত্রুঘ্নর পুত্র, প্রথম ঘরে শুভ, শেষ দুয়ে হস্ত, ৯. ব্রতাদিতে ভক্ষণীয় ঘৃতান্ন, ১০. শ্রীকৃষ্ণ, দুয়ে-চারে ওজনের মাপবিশেষ, ১১. সর্পকুলের রাজা, ১২. হৃদয়, চিত্ত, ১৩. বঙ্গীয় বুু।

সমাধান
শব্দরূপ-৬২১

■	আ	য়া	ন	■	প	রা	গ
■	ঢ্য	■	ন্দ	■	ব	■	রু
অ	■	■	লা	ই	ন	■	ড়
ম	হা	কা	ল	■	■	■	পু
র	■	■	■	দ	শ	হ	রা
ক	■	জ	ল	ধি	■	■	ণ
ণ্ট	■	রি	■	মু	■	বা	■
ক	শ্য	প	■	খ	জ্যো	তি	■

সঠিক উত্তরদাতা

সৃজন কুমার হাজরা
রামপুর, বাঁকুড়া
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬২৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ মে, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে "চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),F.W.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা–
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ২১

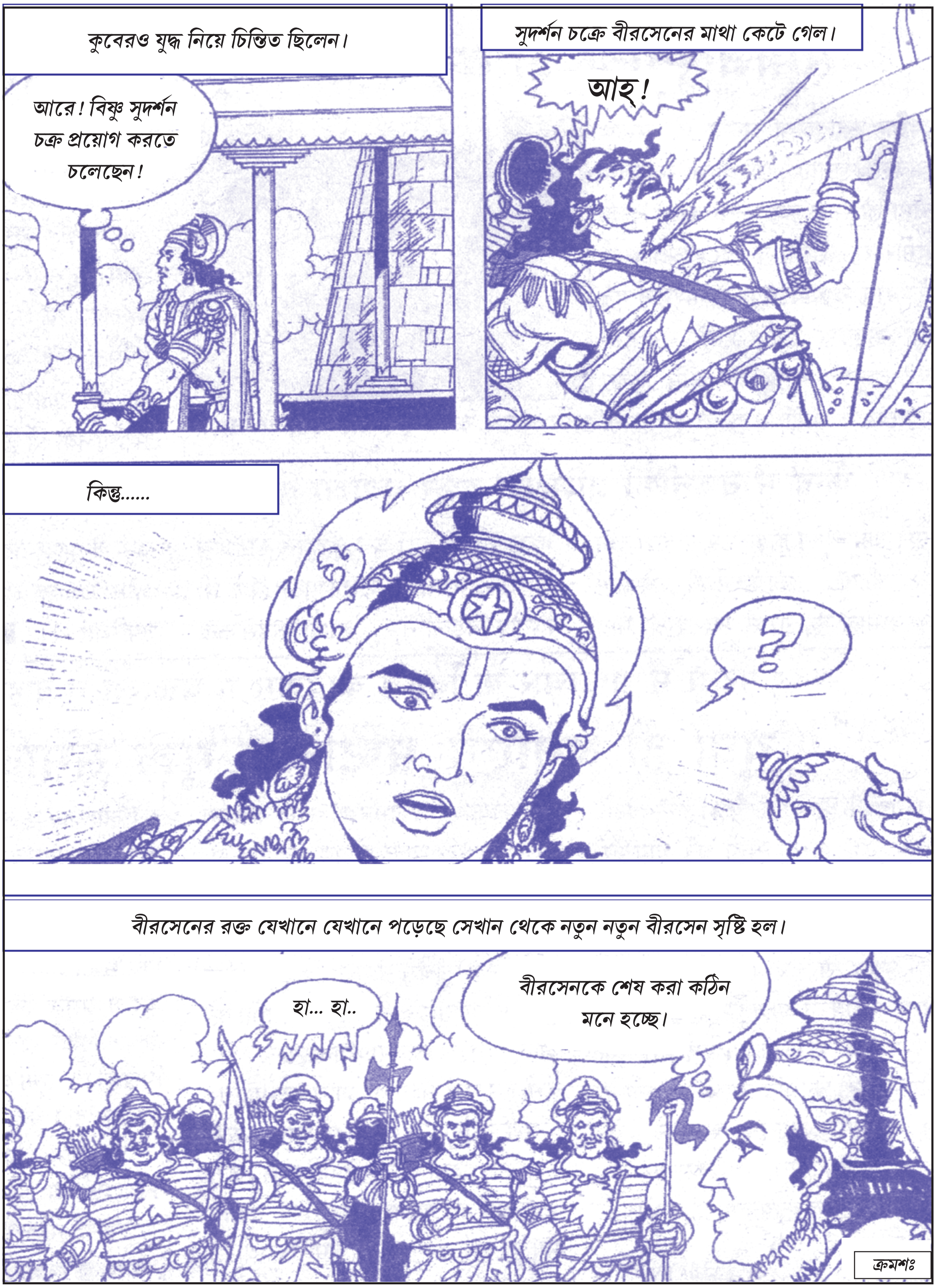

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

হিন্দুদের মতো সকলের মঙ্গলকামনা আর কোথাও করা হয়নি : কৃষ্ণগোপাল শর্মা

বাসুদেব পাল।। "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার-এর নাম ভারতে এবং ভারতের বাইরে খুব কম লোকই জানেন। অথচ তাঁর প্রদর্শিত পথ এবং আদর্শকে ভিত্তি করে সৃষ্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের নেতা অশোক সিংঘল বা দত্তোপন্ত ঠেংড়ির নাম বেশির ভাগ মানুষই জানেন। ওই সকল পরিচিত ব্যক্তিদেরও প্রেরণার উৎস কিন্তু ডাঃ হেডগেওয়ার। ডাক্তারজী নিজেকে সদাসর্বদা প্রচার, প্রসিদ্ধির থেকে আড়ালে রাখতেন। তিনি সেই ১৯২৫ সালেই ঘোষণা করেছিলেন— 'এদেশ হিন্দুরাষ্ট্র।' তাঁর ওই ঘোষণায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, বীর সাভারকার প্রমুখ ব্যক্তিরা আনন্দিত হয়েছিলেন। হয়তো স্বর্গবাসী লোকমান্য তিলকের আত্মাও সন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন।"

যোগেন্দ্রজীকে চেক ও মানপত্র প্রদান করছেন ডঃ কৃষ্ণগোপালজী। বাঁদিক থেকে - রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবরাও দেশমুখ, তরুণ মজুমদার, ডঃ প্রেমশংকর ত্রিপাঠী ও যুগলকিশোর জৈথেলিয়া।

উপরোক্ত বক্তব্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণগোপাল শর্মার। তিনি গত ২৯ এপ্রিল সকালে কলকাতার বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আয়োজিত ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা-সম্মান অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার বহুপরিচিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা 'কুমারসভা পুস্তকালয়' সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারের জন্মশতবর্ষ অর্থাৎ ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ থেকে তাঁর নামে প্রতিবছর এই সম্মান দিয়ে আসছে। এবার ছিল ২৩তম অনুষ্ঠান। এবছর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ৮৮ বছর বয়স্ক প্রবীণ প্রচারক এবং কলাক্ষেত্রে সক্রিয় সংগঠন 'সংস্কার ভারতী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কুশল ও সফল সংগঠক যোগেন্দ্রজীকে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা-সম্মানে ভূষিত করা হয়। ডঃ শর্মা আরও বলেন, ডাক্তার হেডগেওয়ারের দৃষ্টিকোণ ছিল মৌলিক। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল এদেশের বিকাশ অস্ত্রবলে হয়নি। ভারতবর্ষ প্রাচীন রাষ্ট্র এবং হিন্দুরাষ্ট্র— যার আত্মা হলো হিন্দুত্ব। যুগ যুগ ধরে ঋষি-মুনিরা তাঁদের প্রজ্ঞা ও তপস্যাবলে এই রাষ্ট্র নির্মাণ করেছেন। বৈদিক শ্লোকে তার উল্লেখ রয়েছে—

ভদ্রম্ ইচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদঃ
তপোদীক্ষাম্ উপাসেদুরাগ্রে,
ততো রাষ্ট্রম্ বলমৌজশ্চ জাতম্
তদস্মৈ দেবাঃ উপসংনমন্তু।।

এই হিন্দুরাষ্ট্রের কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্ত হলো—

সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিরাজমান।

একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। অর্থাৎ সত্য এক, পণ্ডিতেরা তা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন।

সর্বে ভবন্তুঃ সুখিনঃ। অর্থাৎ সকলে সুখী হোক।

মাতা ভূমি, পুত্রোহম্ পৃথিব্যাঃ। ভূমি বা পৃথিবী মা, আর আমরা তার পুত্র।

এধরনের সর্বসমাবেশক, সকলের মঙ্গলকামনা আর কোথাও বলা হয়নি। পাশ্চাত্যের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। অ্যাংলো স্যাক্সনরা অস্ত্রের জোরে জার্মানী, ইংল্যান্ড (ইউ কে) এবং আমেরিকা (ইউ এস এ) গঠন করেছে। নিরাকার, সাকার উপাসকরা এদেশে একাকার। সকলের উপাসনার স্বাধীনতা এখানে স্বীকৃত। এমনকী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতিরাও এই পরম্পরাকে স্বীকার করে চলেন।

সভার অন্যতম বক্তা যাদবরাও দেশমুখ সংগঠক যোগেন্দ্রজীর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক সবার সামনে তুলে ধরেন।

সংবর্ধনার উত্তরে যোগেন্দ্রজী ভারতীয় সঙ্গীতকলার বাঙ্ময় রূপ সবার সামনে তুলে ধরেন— যেখানে সঙ্গীতজ্ঞ গানের মাধ্যমেই বৃষ্টি আনে; অনিদ্রা, অসুখ নিরাময় করে। সভাপতি প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক তরুণ মজুমদার তাঁর ভাষণে ডাক্তার হেডগেওয়ারকে বিবেকানন্দের সার্থক উত্তরসূরী বলে উল্লেখ করেন।

শ্রীমতী গোপা চ্যাটার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে সভা শুরু হয়। মঞ্চস্থ অতিথিরা সকলে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। পুস্তকালয়ের সভাপতি ডঃ প্রেমশংকর ত্রিপাঠী যোগেন্দ্রজীর গলায় মালা দিয়ে বরণ করেন। তাঁকে শাল জড়িয়ে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ মজুমদার। শ্রীফল দেন যাদবরাও দেশমুখ। ৫১ হাজার টাকার চেক ও মানপত্র প্রদান করেন ডঃ কৃষ্ণগোপালজী। যোগেন্দ্রজীর আগ্রহে চেক সংস্কার ভারতীর নামেই দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে স্বল্প বক্তব্য রাখেন ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। সভা পরিচালনা করেন বিমল লাঠ এবং শেষে ধন্যবাদ জানান যুগলকিশোর জৈথেলিয়া।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
7 May - 2012

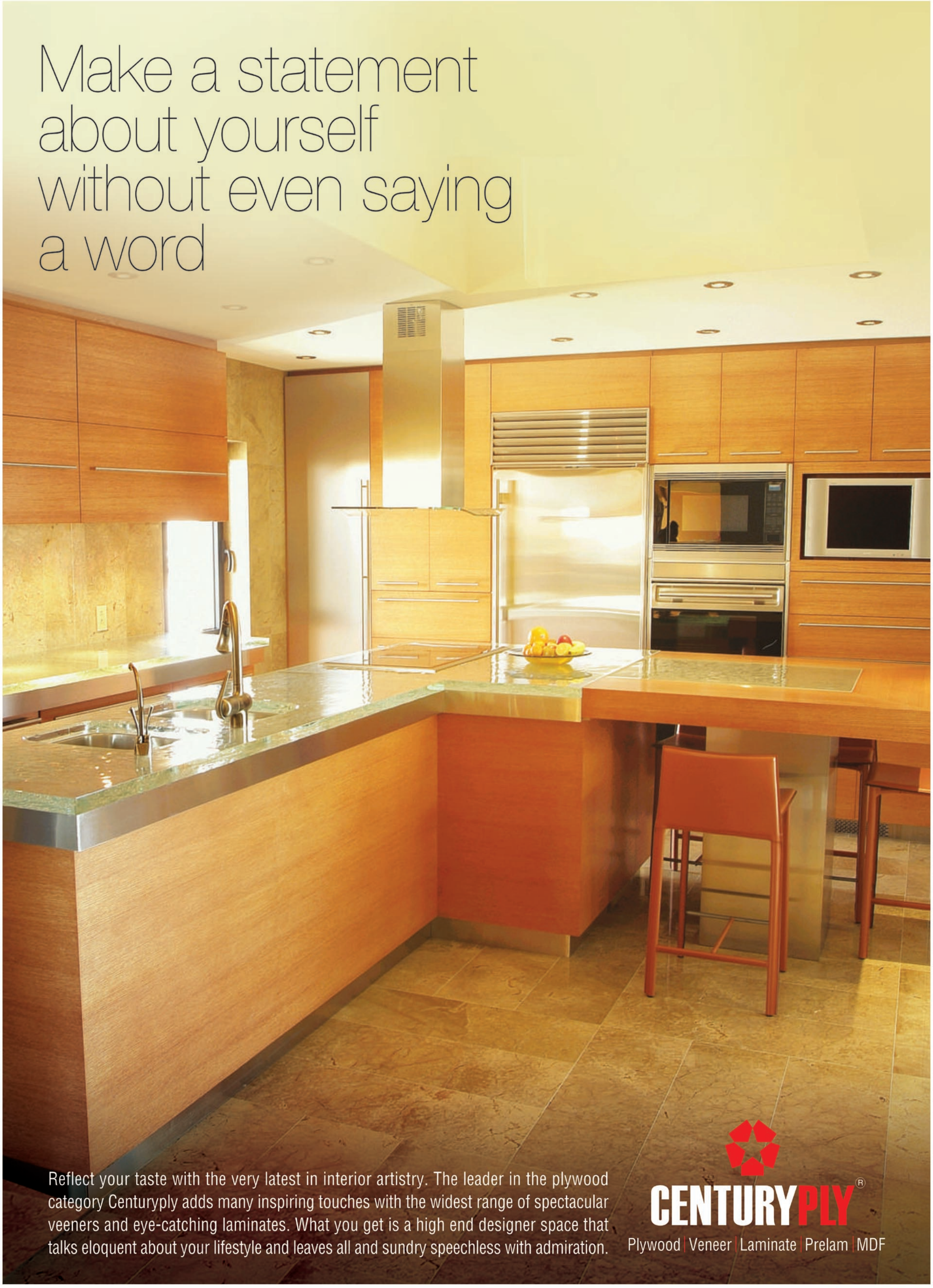

দাম : ৭.০০ টাকা